বাংলাদেশের সুন্দরবনে বিলুপ্ত জনগোষ্ঠী ঃ
খুলনার শেখেরটেকের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

গবেষণা উপস্থাপনায় ঃ

আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী

এম. ফিল নিবন্ধন নং-২৪৮

শিক্ষাবর্ষ-২০০৪-২০০৫

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঃ

ড. মোঃ নুরুল ইসলাম

অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

সেপ্টেম্বর, ২০১২

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

RB
B
930.1
SIB
C . 2

Acc: 466825

Dhaka University Library
466825

466825

শেখেরটেকের কালী মন্দির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এম, ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

GIFT

বাংলাদেশের সুন্দরবনে বিলুপ্ত জনগোষ্ঠীঃ খুলনার শেখেরটেকের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

অভিসন্দর্ভ জমা দেয়ার তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এম, ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সুন্দরবনে বিলুপ্ত জনগোষ্ঠীঃ খুলনার শেখেরটেকের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

গবেষণা উপস্থাপনায়

আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী
এম ফিল নিবন্ধন নং- ২৪৮
শিক্ষা বর্ষ- ২০০৪-২০০৫
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

466825

গবেষণা তত্ত্বাবধায়কঃ

ড. মোঃ নুরুল ইসলাম
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এম, ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সুন্দরবনে বিলুপ্ত জনগোষ্ঠীঃ খুলনার শেখেরটেকের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

(প্রফেসর ড. মোঃ নুরুল ইসলাম)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের অনুমোদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এম, ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের সুন্দরবনে বিলুপ্ত জনগোষ্ঠীঃ খুলনার শেখেরটেকের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এর আগে কেউ গবেষণা করেনি। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রির জন্য লেখা হয়েছে। আমি অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করিনি।

আল জামাল মোস্তফা সিদ্দাইনী

(আল জামাল মোস্তফা সিদ্দাইনী)

রেজিষ্ট্রেশন নং- ২৪৮
শিক্ষা বর্ষ- ২০০৪-২০০৫,
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

466825

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ফিল গবেষক আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী কর্তৃক উপস্থাপিত " বাংলাদেশের সুন্দরবনে বিলুপ্ত জনগোষ্ঠীঃ খুলনার শেখের টেকের উপর একটি সমাজ তাত্ত্বিক সমীক্ষা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি তার একক গবেষণার ফল। আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তিনি এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেছেন। আমার জানামতে এ শিরোনামে এর আগে কোন কাজ করিনি। আমি গবেষণা কর্মটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। ঐতিহাসিক খুলনার শেখেরটেকের উপর এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে।

আমি অভিসন্দর্ভটি এম, ফিল ডিগ্রির জন্য জমা নেয়া এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করছি।

(প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম)
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বেও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস দীর্ঘদিনের নয়। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সুন্দরবনে বিলুপ্ত জনগোষ্ঠীঃ খুলনার শেখেরটেকের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার মাধ্যমে এ অঞ্চলের আর্থ সামাজিক অবস্থা নিরুপণ করা অভিসন্দর্ভটির মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবনের নলিয়ান ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিস থেকে ৩০ কিঃ মিঃ দক্ষিণে শিবসা নদীর সাথে শেখের খাল ও কালীরখাল সংযোগ স্থল শিবসা মন্দির পরিবেষ্টিত প্রত্নস্থল শেখেরটেক এর অবস্থান। সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে অবস্থিত। আলোচ্য প্রত্নস্থলটি পরিদর্শন করা দুস্কর। তাছাড়া জনসংখ্যার ক্রমাগত উর্ধগতি, লবনাক্ততা, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, বৃষ্টিপাত, ঝড় ও জনসচেতনতার অভাবের কারনে দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে এ দেশের অসংখ্য পুরাকীর্তি তথা সাংস্কৃতিক সম্পদ। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অসংখ সূত্র। তাই শেখেরটেকের বর্তমান অবস্থা ও এখানকার জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার অতীত স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস ছিলো সমগ্র অভিসন্দর্ভটি জুড়ে।

আধুনিক সময়ে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় যে বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হলো সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা কাজ পরিচালনা করা। তাই অভিসন্দর্ভটি সম্পাদনে সুলভ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক নিদর্শণের বিশ্লেষণ, মাঠ পর্যায়ের বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক আলোচার মাধ্যমে অভিসন্দর্ভটি সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, খ্রিষ্ট্রীয় ষোল-সতের শতকে এ অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জনজপদের অস্তিত্ব ছিলো। আর এ জনপদ প্রশাসনিক ইউনিটের কেন্দ্রস্থল ছিলো । তাদের আর্থ সামাজিক জীবন যাত্রায় দূর্গের প্রভাব বিদ্যমান ছিলো। মূলত এ জনপদটি দূর্গকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার আওতাভূক্ত ছিলো। মুঘল আমালে এটা নির্মাণ করা হয়। সাংস্কৃতিক নিদর্শণের বিশ্লেষণ এর পক্ষে যুক্তি প্রদান করে থাকে। তবে পরবর্তিতে এ জনপদেও অধিবাসী প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে স্থানান্তরিত হয়েছিলো। বিপদ সংকুল জায়গায় গবেষণা ক্ষেত্রটি অবস্থিত হবার কারনে স্বল্প পরিসরে গবেষণা কর্মে সম্পূর্ণ রূপে তথ্য উৎঘাটনে সহায়ক নয়। ব্যাপক খননকার্য পরিচালনা করলে দক্ষিনাঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

"বাংলাদেশের সুন্দরবনে বিলুপ্ত জনগোষ্ঠীঃ খুলনার শেখেরটেকের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা" একটি এম,ফিল গবেষণামূলক প্রস্তাবনা। এ গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম। যাঁর অনুপ্রেরনায় ও সান্নিধ্যে আমি আমার গবেষণা কর্মটি সম্পাদন সমাপ্ত করতে পেরেছি। আমি তার কাছে চিরঋনী। পরম করুনাময়ের কাছে আমি তার সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করছি। অন্যান্য যাঁরা আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমার লেখার কাজকে সহজ করে দিয়েছেন তারা হলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারি অধ্যাপক তুহিন রায় এবং সালেহ মাহমুদ। সর্বোপরি যার কথা না বললেই নয় তিনি হলেন আমার পিতা অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী। তিনি গবেষনার বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা ছাড়া হয়তো এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনই সম্ভব হতো না।

প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশণের সূত্র ধরে আর্থসামাজিক অবস্থা নিরুপনের প্রয়াস অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। সমাজবিজ্ঞান আজ বিভিন্নমূখী চর্চার মাধ্যমে নতুন নতুন ক্ষেত্রের বিকাশ সাধন করছে। আলোচ্য গবেষনা কর্মটি তেমনি একটি প্রয়াস। একটু বাড়িয়ে বলতে গেলে একটি সুচনা যা তথ্যের আধার কে আরও সমৃদ্ধ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ঘোষণা পত্র	ক
প্রত্যায়ন পত্র	খ
প্রসঙ্গ কথা	গ
সূচিপত্র	ঘ
প্রথম অধ্যায়	
১.১ ভূমিকা	০১
১.২ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	০১
১.৩ গবেষণা পদ্ধতি	০১
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারনের যৌক্তিকতা	০১
ঐতিহাসিক পদ্ধতি	
পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি	
সাক্ষাৎকার পদ্ধতি	
প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি	
১.৫ প্রত্যয়গত সংজ্ঞা	০৪
বাংলাদেশের সুন্দরবন	
শেখেরটেক	
বিলুপ্ত জনগোষ্ঠী	
সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা	
১.৬. গবেষণা কর্মের সাথে সম্পর্কিত কার্যাদির সমালোচনামূলক বিবরণ	০৬
১.৭ গবেষণার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব	১২
১.৮ গবেষণার সময় পরিধি	১৩
১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
২.১ সুন্দরবনে সভ্যতার ইতিহাস	১৫
২.২ সুন্দরবনে পুরাকালীন জনপদ	২৪
২.৩ সুন্দরবনে মানববসতি	৩৪
২.৪ সুন্দরবনের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী মুন্ডারাই	৩৫
২.৫ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবনে শেখেরটেক	৩৯
২.৬ শেখেরটেকের জনগোষ্ঠী	৪০
২.৭ শেখেরটেকের জনগোষ্ঠী স্থানান্তরিত	৪১
২.৮ গবেষণা ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা	৪২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট শেখেরটেক ৪৫
৩.২ সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি থেকে শেখেরটেক ৪৭
৩.৩ পর্যবেক্ষণে সুন্দরবনের শেখেরটেক ৫১
৩.৪ ইতিহাস বিদদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে শেখেরটেক ৫২

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ শেখেরটেকের সামাজিক অবস্থা ৫৮
৪.২ শেখেরটেকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ৫৮
৪.৩ শেখেরটেকের অর্থনৈতিক অবস্থা ৬০
৪.৪ জনবসতির অস্তিত্ব ৬১
৪.৫ শেখেরটেকের অবস্থান গত বিভ্রাট ৬১
৪.৬ মুঘল আমলের নিদর্শণ ৬২
৪.৭ কামারবাড়ী রহস্য উদঘাটন ৬৪
৪.৮ কবরস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়নি ৬৬
৪.৯ লোকালয়ে জন্মে এমন বৃক্ষের অস্তিত্ব ৬৬
৪.১০ গবেষণাকর্মের প্রাপ্ত তথ্যের বিশেষন ৬৬

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ গবেষণাকর্মের পর্যালোচনা ৬৯
৫.২ উপসংহার ৭০
৫.৩ সুপারিশসমূহ ৭১
তথ্য নির্দেশ ৭২

চিত্রের তালিকা

শেখেরটেকের কালী মন্দিরের ছবি - ২০১০ ৪৪
শেখেরটেকের কালী মন্দিরের ছবি - ২০১২ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নৃতত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস দীর্ঘদিনের নয়। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে পাশ্চাত্যের ওরিয়েন্টালিস্টদের দ্বারা এর সূচনা হয়। উইলিয়াম জোনস্ হ্যামিলটন বুখানন, ফ্রান্সিস বুখাননসহ আরো বহু ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[১] সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সুন্দরবনে বিলুপ্ত জনগোষ্ঠীঃ খুলনার শেখেরটেকের উপর একটি সমাজ তাত্ত্বিক সমীক্ষার মাধ্যমে এ অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থা নিরুপণ করায় অভিসন্দর্ভটির মুল উদ্দেশ্য।

১.২ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

বর্তমান বাংলাদেশের দুর্গম ও স্বাপদ সংকুল অঞ্চল সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের মধ্যে মোগল আমলের যে প্রত্নস্থলটি বর্তমান তা হলো শিবসা মন্দির পরিবেষ্টিত শেখেরটেক প্রত্নস্থল। শেখেরটেকের প্রত্নস্থলটির বিবরণ, জনগোষ্ঠী ও গুরুত্ব উপস্থাপন করা হবে বক্ষমান অভিসন্দর্ভের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

অভিসন্দর্ভটি সম্পাদনে মূলত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি গ্রহন করা হয়েছে। এ প্রত্নস্থলে অবস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শণ বিশ্লেষণ, মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ এবং তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে শিবসামন্দির কেন্দ্রিক আলোচ্য প্রত্নস্থলটি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। সেহেতু প্রাথমিক উৎসের অভাব রয়েছে। যেহেতু Secondary source এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। পাশাপাশি প্রাচীন বিলুপ্ত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যে সকল নিদর্শণ এখনো বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোরও পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। এ ছাড়া যে সকল লেখক শেখেরটেক নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন তাদের মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারনের যৌক্তিকতা

Adams & Schvaneveldt - এর মতে "Research methodology is the application of scientific procedures toward acquiring answers to a wide variety of research questions."[2] যুগ যুগ ধরে সমাজ গবেষকরা সমাজ গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছেন। আধুনিক সময়ে সমাজতত্ত্বিক গবেষণায় যে বিষয়টির উপর প্রতি গুরুত্ব আরোপ

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়ে থাকে তা হলো সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা কাজ পরিচালনা করা। গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণে যদি কোন সমস্যা দেখা যায় সে ক্ষেত্রে গবেষণা কর্ম সুষ্ঠ ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই অভিসন্দর্ভের ক্ষেত্রে সে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরার আবশ্যকতার প্রয়োজন অনুভব করছি। যদিও ভূমিকাতেই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের নৃতত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস দীর্ঘদিনের নয়। তবে এই পদ্ধতিতে জনগোষ্ঠীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের নজির রয়েছে। তাই এই গবেষণা কর্মে ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতিকেই অধিক যুক্তিযুক্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। সমাজের বিভিন্ন ঘটনার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি থাকে, অতীতের মধ্যেই বর্তমান নিহিত থাকে। আর বলা হয় যে, কোনো কিছুই আকাশ থেকে আসে না। তাই সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি পায় এ কারনে যে, সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, বিবর্তনের সূত্র, মানব সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় লোকাচার, বিশ্বাস ইত্যাদি সকল কর্মকান্ডের অতীত ইতিহাস বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে তুলনীয়। সমাজবিজ্ঞানিরা উল্লেখ করেন যে, একজন ব্যক্তি জৈবিক একক হিসেবে লোকান্তরিত হতে পারে কিন্তু তিনি তার বিশ্বাস, আচার-আচার আচরণ, সংস্কৃতি ইত্যাদি মানবসমাজ ত্যাগ করে যান। ফলে ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু ঘটলেও তার অনেক কিছুই মানব সমাজে চলমান থাকে উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে। বস্তুত এসব কারনে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের প্রতিতযশা সমাজ গবেষকরা ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী আগস্ট কঁৎ, হার্বার্ট স্পেন্সার, হব হাউস, কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবারসহ পাশ্চাত্যের অসংখ্য সমাজবিজ্ঞানী সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। উপ মহাদেশ থেকে উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, ভারতের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর এ, আর দেশাই; প্রফেসর ডি, এন, ধানাসারে; প্রফেসর সোগন্ড সিং, প্রফেসর এ, কে, সেন; অধ্যাপক ইরফান হাবিব; বাংলাদেশের অধ্যাপক নাজমুল করিম; অধ্যাপক অনুপম সেন; পাকিস্থানের হামজা আলভি প্রমুখ।[৩] ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন অপরিহার্য হয়ে পড়ে বিশেষ করে গতানুগতিক সমাজ সম্পর্কে গবেষণার জন্য। কোনো সমাজ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো আবার কি ভাবেই বিলুপ্ত হলো তার সঠিক ধারা বুঝতে হলে ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া মানুষ মাত্রই অতীত সম্পর্কে জানতে চায়।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে সমাজ গবেষকদের মানুষের যে চাহিদা পূরণ করতে হয়। কেবল ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে তা করা সম্ভব।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

সামাজিক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের একটি অন্যতম কৌশল হচ্ছে পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে গবেষক মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। বিশেষ করে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে জড়িত কোন স্থান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

Jary & Jary এর মতে সাক্ষাতকার হচ্ছে "a method of collecting social data at the industrial level."[৪] তাই তথ্য সংগ্রহের যে কয়টি পদ্ধতি রয়েছে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি তন্মধ্যে অন্যতম। তবে এই গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক, লেখক সুন্দরবনের গবেষক এবং সর্বোপরি শেখেরটেক নিয়ে যারা অনেকদিন ধরে কাজ করছেন এবং বিভিন্ন লেখনিতে প্রকাশ করেছে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংগ্রহের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি

আধুনিক মানুষের দৈহিক গুণাবলী পর্যালোচনার জন্য উপযুক্ত কৌশল নৃতত্ত্ববিদ স্বয়ং উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু ফসিল-মানুষের আলোচনায় তাঁকে নানা পেশাদার বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হয়। নৃতত্ত্বের কর্মক্ষেত্র অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কর্ম-ক্ষেত্রকে অধিক্রমন করে যায়। এই অধিক্রমন মানব-বিবর্তনের ক্ষেত্রে বড় বেশি সত্য। মানব সমাজের বিবর্তনের ক্ষেত্রে বড় বেশি সত্য। মানব-সমাজের বিবর্তনের আলোচনা করতে হলে, নৃতত্ত্ববিদকে প্রত্নতত্ত্ববিদকে, ভূতত্ত্ববিদ ও প্রত্নজীববিদদের দেওয়া মাল মসলার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সুযোগ নেই। কেননা প্রায় ৪০০ বছর আগে বিলুপ্ত জনগোষ্ঠীর কোন কবর ও ফসিল পাওয়া যায়নি। তাছাড়া বিপদ সংকুল ও দুর্গম অঞ্চলে (গহীন জংগলে) অবস্থান হওয়ায় সে ধরনের অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। তাই মন্দির ও বিভিন্ন ঢিবি থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি স্থাপনাগুলোর গঠন, আকৃতি, নকশা কাঠামো তৈরির উপকরণ এর মাধ্যমে ওই এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

করে কোন সময়ে গড়ে উঠে ছিলো সে সম্পর্কে একটা ধারনা পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া ঐতিহাসিকদের মতে এই জায়গাটি কামার বাড়ী হিসেবে পরিচিত ছিলো। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে এ গবেষণা ক্ষেত্রের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষনের মাধ্যমে এই প্রত্নস্থল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব।

১.৫ প্রত্যয়গত সংজ্ঞা

গবেষণা কর্মটি সহজে উপলব্ধি করার জন্য প্রত্যয়গত বিষয়টি সহজ করার আবশ্যকতা রয়েছে। তাই প্রত্যয়গত সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশের সুন্দরবন

এখানে সুন্দরবন বলতে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে ২১°৩৯´ ০০´´ হতে ২১° ৩০১৫´´ উত্তর একাংশ এবং ৮৯°২৯´ ০৪´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত বলকে বুঝানো হয়েছে। এ বনের বর্তমান মোট আয়তন ৬ হাজার ১৭ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে স্থলভাগের পরিমান ৪ হাজার ১৪৩ বর্গকিলোমিটার (যা সমগ্র সুন্দরবনের ৬৮.৮৫ শতাংশ) এবং জলভাগের পরিমান ১ হাজার ৮৭৪ বর্গ কিলোমিটার (যা সমগ্র সুন্দরবনের ৩১.১৫ শতাংশ)।[৫]

শেখেরটেক

শেখ শব্দটি এসেছে শ্যায়েখ আরবি শব্দ থেকে। যার অর্থ বিশেষজ্ঞ বা পন্ডিত ব্যক্তি। জনৈক শেখ শেখেরটেকের* পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর উত্তর অংশের নাম করন করেছিলেন শিব দেবতার নামে শিবসা আর মুসলমানদের আরবি ভাষায় দক্ষিনাংশের নামকরন করেছিলেন মারজান বাহার। যা পরবর্তীতে মর্জাল নাম হয়েছে। কারণ এই শেখ প্রতাপাদিত্যের অধীনে ছিলেন। রাজা প্রতাপাতিদ্য সম্রাট আকবরে দ্বীন-ই-এলাহীর অনুসারী ছিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য সাতক্ষীরা জেলার শ্যাম নগর উপজেলার ঈশ্বরীপুরে পাশাপাশি মন্দির ও মসজিদ নির্মান করেছিলেন। এ মসজিদ মন্দির আজও আছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবনের নলিয়ান ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে ৩০ কি.মি. দক্ষিণে শিবসা নদীর সাথে শেখের খাল ও কালীর খাল সংযোগ স্থলে শিবসা মন্দির পরিবেষ্টিত প্রত্নস্থল শেখেরটেক-এর অবস্থান। সুন্দরবনের পুরনো ২৩৩ লাটের (বর্তমান ৫২৫ নং ঘের) গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ১.৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আলোচ্য প্রত্নস্থলটির অবস্থান। শিবসা মন্দির কেন্দ্রিক আলোচ্য

*ট্যাক থেকে টেক হয়েছে যার অর্থ উঁচু জায়গা। নদীর উঁচু চরকে ট্যাক বলে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্নস্থলটি শেখেরটেক বা শেখেরবাড়ি নামে পরিচিত। শেখেরটেক প্রত্ন স্থলে দুটি মন্দিরের অবস্থান। একটি শিব মন্দির, অন্যটি কালী মন্দির।[৬] কালীকে শক্তির দেবতা বলা হয়।

বিলুপ্ত জনগোষ্ঠী

বিলুপ্ত জনগোষ্ঠী বলতে কোন জনগোষ্ঠীর পৃথিবী থেকে বিলুপ্তিকে বুঝানো হয়নি বরং শেখেরটেক যে জনগোষ্ঠী বসবাস করত তাদের বসবাস কিভাবে বিলুপ্ত হয়েছিলো তাকে বুঝানো হয়েছে। তাই স্বাভাবিক অর্থে জনগোষ্ঠীর বিলুপ্ত বলতে যা বুঝায় এ গবেষণায় কিন্তু তা অনুসরণ করা হয়নি। বরং শেখেরটেকের জনগোষ্ঠীর বসবাসের সমাপ্তিকে বুঝানো হয়েছে জনগোষ্ঠীর বিলুপ্ত হিসেবে।

সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

এখানে সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা বলতে সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনাকে বুঝানো হয়েছে। যে কোন সমাজের সামগ্রিক অবস্থা জানার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনাই হলো সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা। বর্তমান বাংলাদেশের দূর্গম ও স্বাপদ সংকুল অঞ্চল সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের মধ্যে মোঘল আমলের যে প্রত্নস্থলটি বর্তমান তা হলো শিবসা মন্দির পরিবেষ্টিত শেখেরটেক। শেখেরটেকের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব যেমন রয়েছে তেমনি পাশাপাশি সমাজ তাত্ত্বিক গুরুত্বও বিদ্যমান। বাংলাদেশের সুন্দরবনে মানবজাতির বসবাস অনেক আগে থেকেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে শেখেরটেকের অধিবাসী কারা ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তা ছাড়া সুন্দরবনের গভীর অরণ্য অবস্থিত আলোচ্য শেখেরটেক পরিদর্শণ করা দুস্কর। অনুসন্ধানে যদি কোথাও নগরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় সেখানেই এক সময় জনবসতি ছিল এটাই স্বাভাবিক ধারনা সেই প্রেক্ষাপটে শেখেরটেক যে সমৃদ্ধ নগরী ছিলো এতে কোন সন্দেহ নেই। নগরে অধিবাসী ছিলো এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজও পর্যন্ত তেমন কোন গবেষণা পরিচালিত হয়নি যার মাধ্যমে উপরোক্ত জায়গার সঠিক আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। তাছাড়া জনসংখ্যার ক্রমাগত উর্ধগতি, লবনাক্ততা, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, বৃষ্টিপাত, ঝড় ও জন সচেতনতার অভাবের কারনে দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে এ দেশের অসংখ্য পুরাকীর্তি তথা সাংস্কৃতিক সম্পদ। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের অজস্র সূত্র। বৈরী আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে গভীর সুন্দরবনের এই নগরটি ধ্বংস হয়ে যায়। আর এলাকাটি তারপর থেকে বিপদ সংকুল স্থানে পরিনত হবার কারনে লোক চক্ষুর অন্তরালে পড়ে যায়। হয়ত অদুর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে শেখেরটেক এবং আমাদের কাছে লুকায়িত থেকে

Dhaka University Institutional Repository

যাবে এর সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব। বাংলাদেশের ইতিহাস কে সঠিকভাবে রচিত করতে এবং অতীতের আর্থসামাজিক অবস্থার সঠিক চিত্র নিরুপন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বিকল্প নেই।

১.৬. গবেষণা কর্মের সাথে সম্পর্কিত কার্যাদির সমালোচনামূলক বিবরণ

ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর যশোর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, "শেখের খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডান দিকে চতুর্থ পাশাখালির পার্শ্বে একস্থলে ইষ্টক গৃহের ভগ্নাবশেষ ও কয়েকটি গাব গাছ দেখা যায়। তথা হইতে উঠিয়া বনের মধ্যে প্রায় এক মাইল গেলে, একটি দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাওয়ালীরা ইহাকে 'বড় বাড়ী' বলে। সম্ভবতঃ ইহাই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শিবসা দুর্গ, দুর্গের অনেক স্থানে উচ্চ প্রচীর এখনও বর্তমান"।[৭] ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র এ প্রত্নস্থল পরিদর্শনকালে উঁচু প্রাচীর দেখার কথা উল্লেখ করলেও বর্তমান পর্যবেক্ষণে উঁচু প্রাচীর বা প্রচীরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সম্ভবত অন্যান্য ঢিবিগুলোকে তিনি প্রাচীর হিসেবে গণ্য করেছেন। বড় বাড়ি চিহ্নিত অঞ্চলে পাশাপাশি দুটি ঢিবি রয়েছে। একটি ঢিবির দৈর্ঘ ৬৫ ফুট এবং প্রস্থ ৫০ ফুট। উভয় ঢিবি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা। '...ঢিবির কোনো স্থানেই ইটের গাঁথনির চিহ্ন দেখা যায় না। অথচ মাটির বয়ন শক্ত এবং রং কালচে ও বাদামি আভাযুক্ত। কোনো কোনো পাটকেলকে খোলামকুচির অনুরূপ মনে হয়। সুতরাং এই ঢিবিতে অতীতে কোনো বসতবাড়ির অস্তিত্ব ছিলো বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া ঢিবি দুটির উচ্চতাও অন্যান্য ঢিবির তুলনায় বেশি। তাই খনন কাজ পরিচালনা করা হলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া স্থাপনার ভিত অংশ অনাবৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুন্দরবনের বাওয়ালীরা (গাছ কাটায় নিয়োজিত শ্রমিক) ও মৌয়ালরা (সুন্দরবনের গাছ থেকে মধু সংগ্রহকারী) এ ঢিবি এবং এগুলোর সংলগ্ন স্থানকে 'বড়বাড়ি' নামে চিহ্নিত করে থাকে।[৮] প্রথমোক্ত ঢিবি সংলগ্নস্থানকে ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র শিবসা দুর্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলার অন্যতম বারভূঁইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের দুর্গ বলে চিহ্নিত করেছেন তিনি। খুলনা অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদনের বলা হয়েছে, He (Historian Satish Chandra Mitra) also claimed that the area was once inhabited by the naval force of king Pratapaditya and was used as a defending outpost against the invading Portuguese and Arakanese armada. After the fall of Pratapaditya to the Mughuls, in the early seventeenth century the area became deserted for more than one hundred years and turned onto ahub of slave trading pirates.[৯]

Dhaka University Institutional Repository

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তাঁর শিবসা মন্দির প্রত্নস্থলঃ শেখেরটেক প্রবন্ধে বলেন যে বার ভূঁইয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রাজা প্রতাপাদিত্যের দক্ষিণ বাংলার বিশাল এলাকায় শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধারণা করা হয়, তিনি জলদস্যু ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য শিবসা দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন। জানা যায়, তাঁর পিতৃপুরুষ বিক্রমাদিত্য সুন্দরবন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহ-এর অনুমতি নিয়ে খানজাহান আলীর খলিফাতাবাদ পরগণার কাছাকাছি সুন্দরবন এলাকার বিরাট অংশে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য শাসন অঞ্চলকে আরো সম্প্রসারিত করেন। তিনি তাঁর রাজধানীকে অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলেছিলেন এতে তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গিয়েছিলো। সে কারণে তাঁর রাজধানীর নামকরণ করা হয় যশোহর অর্থাৎ গৌড়ের যশঃ হরণকারী। এ নামকরণ ইতিহাসের সাথে জড়িত যশোর জেলা। আধুনিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরাপুর নামক স্থানকে চিহ্নিত করেছেন। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া লিখেছেন যে অসংখ্য নদীনালা ও খাল-বিল পরিবেষ্টিত এবং সভ্য জগত থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্য নির্বিঘ্নেই রাজত্ব করেন। সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উত্তর দিকে বর্তমান যশোর অঞ্চলে তাদের রাজ্যসীমা বর্ধিত হয়। কিন্তু কিছু কাল পরে মোগল সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষ বাঁধে। প্রতাপ নানা কৌশলে এসব সংঘর্ষ এড়িয়ে রাজত্ব করতে থাকেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দিকেই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। ইসলাম খান তখন বাংলার সুবেদার। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এনায়েত খানের নেতৃত্বে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতাপের বিরুদ্ধে বিপুল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।[১০] যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন। জনশ্রুত রয়েছে, তাঁকে দিল্লী নিয়ে যাবার পথে বারাণসীতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকাল এবং শাসনকার্য সম্পর্কে লিখিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে এ সম্পর্কে জানার জন্য সহায়ক হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসহ অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। রাজা প্রতাপাদিত্যের শিবসা দুর্গ পরিবেষ্টিত প্রত্ন অঞ্চলটিতে খননকার্য পরিচালিত হলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি ইতিহাস পুনর্গঠনের উপাদান হিসেবে গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হবে নিঃসন্দেহে।

প্রথমোক্ত ঢিবির কৌণিক দূরত্বে অন্য ঢিবিটির অবস্থান। বাওয়ালিরা এ ঢিবিকে শিবমন্দির বলে। ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্রের বর্ণনায় পাওয়া যায়।, "এই দুর্গের উত্তর-পূর্ব বা ঈশান কোণে একটি শিব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

Dhaka University Institutional Repository

আছে।" বর্তমানে এর আকৃতি ঢিবির অনুরূপ। এর পাদদেশের পরিমাপ ৮০ ফুট X ৫৫ ফুট এবং উচ্চতা ৭ ফুট। এর জমি পিঠের সর্বত্রই নানা আকৃতির ইট-পাটকেল ছড়িয়ে আছে। দুটি স্থানে দুটি দেয়ালের কিছু চিহ্ন দেখা যায়। অনুমিত হয় যে, ১৭ সে.মি. X ১৫ সে.মি. X ৫ সে. মি. আকার বিশিষ্ট ইট সুরকি দিয়ে এর দেয়াল তৈরি হয়েছে এবং এ স্থলে ১৪ ফুট বর্গাকার একটি দক্ষিণমুখী এক কোঠাবিশিষ্ট ইমারত ছিলো। দরজার চারপাশে কারুকাজ করা ইটের তৈরি ফ্রেমের চিহ্নও কয়েকটি স্থানে লক্ষ্য করা গেছে। দেয়ালের গড় উচ্চতা ১ ফুট। এ ঢিবি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছু দূর এগিয়ে গেলে একটি পুকুর এবং পুকুর ঘিরে বেশ কিছু ইট পাটকেল ছড়িয়ে রয়েছে।[১১] আর এরই মধ্যে কেবল গাবগাছের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। এ সবের এক প্রান্তে গভীর বন ও নিচু জমি সংরগ্ন স্থানে 'কালীরখাল' নামে অত্যন্ত সরু একটি প্রবাহ দক্ষিণের জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে। কালীর খালের পাড়ে রয়েছে একটি সুন্দর মন্দির। বাওয়ালি ও মৌয়ালদের কাছে এটি 'কালী মন্দির' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র লিখেছেন যে- 'তথা (শিব মন্দির) হতে বের হয়ে একটু অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় একটি সুন্দর মন্দির দৃষ্টিপাতবর্তী হয়। সুন্দরবনের ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে বিবিধ কারুকার্যখচিত এবং অভগ্ন অবস্থায় দন্ডায়মান এমন মন্দির আর দেখা যায় না। তিনি আরো লিখেছেন,'এই মন্দিরটি সুন্দরবনের একটি প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন'।

কালী মন্দিরটি একটি নিরেট মঞ্চের উপর দাঁড়ানো। মঞ্চের উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং এটি বর্গাকার। মুল মন্দিরটি এক কোঠাবিশিষ্ট। এর ভিতরের দিকে প্রতি বাহুর পরিমাপ ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং বাইরের দিকে ২১ ফুট ৩ ইঞ্চি। মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিমে দরজা আছে। দুটি দরজাই খিলান বিশিষ্ট। 'প্রতিটি খিলান দু কেন্দ্রিক আধাগোলাকার এবং একটি সামান্য উত্তল ফ্রেমে আবদ্ধ। কোনগুলো কৌণিক এবং ব্যান্ডযুক্ত। কার্নিস কেমন ছিল তা ভাঙ্গা অবস্থার জন্য বোঝা কঠিন। তবে এটি তিনধাপবিশিষ্ট ছিল বলে অনুমান করা যায়। শিখর পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং এর উপর নানা ধরনের পরগাছাসহ বুনোগাছ জন্মেছে।.... ভিতর দিকে ছাদ আধাবৃত্তাকার।... বাইরের দিকে দেয়াল পলেস্তরা বিহীন।'[১২] পশ্চিম পাশের দরজার পরিমাপ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি X ২ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ওপরের খিলানের উচ্চতা ১ ফুট ৮ ইঞ্চি। দক্ষিণ পাশের দরজার পরিমাপ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি X ২ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং খিলানের উচ্চতা ১ ফুট ৯ ইঞ্চি। উত্তর পাশের দেয়ালের ভিতরের দিকে ৪ ফুট উচ্চ স্থানে একটি কুলঙ্গি বা জানালার খাত আছে। এর পরিমাপ ৩ ফুট X ২ ফুট এবং খিলানের উচ্চতা ১ ফুট ৬ ইঞ্চি। মন্দিরের পূর্বদিকে কোন জানালা বা কুলঙ্গি নেই। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের দিকে উচ্চতা ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চিমঞ্চ ছাড়া বাইরের দিকে এর উচ্চতা ৩৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। যশোহর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যায়, "ইহার খিলানগুলি গোল নহে, পরন্ত মুসলমান স্থাপত্যানগত খিলানের মত ত্রিকোণ।.... মন্দিরের অন্যান্য প্রকৃতি দেখিলে ইহা যে

Dhaka University Institutional Repository

মোগল আমলে কোন হিন্দু কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা সহজ হয়। ... যদিও মন্দিরের গম্বুজ ছাঁদ আছে, কিন্তু চূড়া নাই, কারণ শীর্ষদেশ জঙ্গল সমাকীর্ণ হইয়াছে.... মন্দিরে কোন দেববিগ্রহ নাই, তবুও অনুমান করা যায় যে প্রতাপাদিত্য তাঁহার দূর্গের সন্নিকটে এই কালিকা দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন।..... মন্দিরের বাইরের ইষ্টকে দেয়ালের কার্নিসে নানা কারুকার্য আছে।"[১৩] একই রকম মন্তব্য ধ্বনিত হয়েছে জনাব খসরু চৌধুরীর রচনায়। তিনি লিখেছেন : This (The shibsa Temple) is the only ancient erect structure in the whole of the Sundarban declaring its former flory. Most of the teracotta plaques on the exposed have been stolen, small bricks size shows its pre-Mughal affinity but the design of the building is unmistakeable a Hindu temple.[১৪]

শিবসা দুর্গ তথা বড়বাড়ির প্রায় ১.৫ কি.মি. দক্ষিণে তৃতীয় ঢিবির অবস্থান। এর উচ্চতা পাশের জমিপিঠ থেকে ৬ ফুট, এর দৈর্ঘ্য ১৭৫ ফুট এবং প্রস্থ ৮০ ফুট। এই ঢিবির মাটির রং বাদামি আভাযুক্ত কালচে এবং বয়ন শক্ত। ঢিবির বিভিন্ন অংশে প্রচুর ইট-পাটকেল ছড়িয়ে আছে। অক্ষত অবস্থায় পাওয়া ইটের পরিমান ২১ X ১৭ X ৪.৫ সে. মি. ১৮ X ১৭ X ৫ সে. মি. সহ বিভিন্ন আকার। কোন কোন ইটের গায়ে সুরকির চিহ্নও লেগে আছে। এসব নিদর্শন থেকে প্রমানিত হয় যে, ঢিবিটিতে অতীতে কোন স্থাপনার অস্তিত্ব ছিলো। এসব নিদর্শন থেকে প্রম্মাণিত হয় যে, ঢিবিটিতে অতীতে কোন স্থাপনার অস্তিত্ব ছিলো। তৃতীয় ঢিবির প্রায় ১.৫ কি. মি. দক্ষিণে চতুর্থ ঢিবির অবস্থান। এর উচ্চতা ৪ ফুট, পাদদেশের দৈর্ঘ ৪৫ ফুট ও প্রস্থ ৪৫ ফুট। এর মাটির বয়ন শক্ত এবং রং বাদামি। সর্বত্রই ইট-পাটকেল রয়েছে। চতুর্থ ঢিবির উত্তর-পূর্ব দিকে ১.৬ কি.মি. দূরে পঞ্চম ঢিবি অবস্থিত। বনের সাধারণ সমতল জমিপিঠ থেকে উচ্চতা ৪ ফুট এবং বিস্তৃতি ৪৫ ফুট ৪ ইঞ্চি X ৪০ ফুট। তবে ঢিবিগুলোতে যে এক সময় জনবসতি ছিলো তা মাটির শক্ত গঠন এবং বাদামি আভা দেখে অনুমান করা যায়। তাছাড়া প্রায় সর্বত্রই এলোপাতাড়ি ইট-পাটকেল রয়েছে। এই ঢিবিগুলোর সময়কাল খ্রিষ্টীয় ষোল-সতের শতক।

ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র লিখিত যশোহর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে কালী মন্দিরের বিবরণে পাওয়া যায়, "অতীতে মন্দিরের কার্নিসের নিচে কিছু কারুকাজ ছিলো। তাছাড়া উত্তর দেয়ালে পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল খচিত দেয়াল খিলান নকসা রয়েছে। বর্তমানে মন্দিরটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ এবং এর নকশা বোঝার উপায় নেই। তবে কোনো কোনা স্থানে মূল নকশার ছিটোফোটা চিহ্নিত করা সম্ভব। মন্দিরটি নির্মানের সময়কাল আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ষোল-সতের শতক কিংবা তৎপূর্বে।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

সতীশ চন্দ্র মিত্র মন্দির পরিদর্শনকালে কালী মন্দিরটি অভগ্ন অবস্থায় দেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন। পূর্বেই উক্ত হয়েছে বর্তমানে মন্দিরের জীর্ণাবস্থা। বাংলাদেশের অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ন্যায় এ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য বাংলাদেশের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক ইমারত বর্তমানে ধ্বংস প্রাপ্ত। সতীশ চন্দ্র মিত্রের পরিদর্শনকালে উক্ত মন্দিরসহ আলোচ্য প্রত্নস্থলটির সংরক্ষণকার্য পরিচালিত হলে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংরক্ষিত হতো। সুধীজনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর বর্তমানে প্রাপ্ত শেখেরটেক প্রত্নস্থলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণে এগিয়ে না আসলে বোধহয় এটা অস্বাভাবিক নয় যে কালচক্রের ঘূর্ণাবর্তে শেখেরটেক প্রত্নস্থল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞানতার অমানিশায় হারিয়ে যাবে চিরতরে। তবে আশার কথা- ২০০৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত একটি বেসরকারী পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত জরিপ প্রতিবেদন প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন : বৃহত্তর খুলনা গ্রন্থে আলোচ্য প্রত্নস্থল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ মহতী কাজের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদার্হ। সেই সাথে আমাদের একান্ত প্রত্যাশা- প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর আলোচ্য প্রত্নস্থলের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ প্রত্নস্থলের সংরক্ষণ ও খনন কার্যে এগিয়ে আসবেন।

অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী তার বিলুপ্ত নগরী শেখেরটেক প্রবন্ধে বলেন, ''১৯১৪ সালে সতীশচন্দ্র মিত্র শেখেরটেকে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি শেখের টেকের মন্দির সম্পর্কে লিখেছেন, মন্দিরের দক্ষিণ দিকে জঙ্গল খুব নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর দিকে এখনও প্রশস্ত পরিস্কৃত জমি আছে এবং তাহা বেশ উচ্চ। মন্দিরে কোন দেব বিগ্রহ নাই, তবু অনুমান করা যায় যে প্রতাপাদিত্য তাহার দুর্গের সন্নিকটে এই কালিচা দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। তজ্জন্য মন্দিরের নিকট দিয়া প্রবাহিত খালটি 'কালীর খাল' নামে অভিহিত হইয়াছে। সরকারী ম্যাপেও এখনও কালীর খাল নাম বিলুপ্ত হয় নাই। যশোরেশ্বরীর মন্দিরের মত ইহারও পশ্চিম দিকে সদর বলিয়া বোধ হয়। আমাদের সংগে যে এক বাবু খাঁ বাওয়ালী ছিলেন, তিনি ২৫/৩০ বৎসর সুন্দরবনে আসিতেছেন। তিনি বললেন ১৪/১৫ বৎসর পূর্বে কোন একদল বিশিষ্ট ভদ্রলোক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া আসিয়া মহাসমরোহে এই মন্দিরে কালী পূজা দিয়া গিয়াছেন। বাবু খাঁ সে সময়ে এই জঙ্গলে আসিয়াছিলেন। মন্দিরের পশ্চিম দিকে ঐ পূজার বলি হয়। ঠিক যে স্থানে সে বলি হইয়াছিল, বাবু খাঁ সেই স্থানটি আমাদিগকে প্রদর্শন করালেন। কিন্তু এমন জীবন্ত দর্শক স্বাক্ষী পাইয়াও আমরা তাহার বর্ণনায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে সম্মত নই,

Dhaka University Institutional Repository

কারণ নিরক্ষর গল্প রসিক বৃদ্ধ বাওয়ালী গল্পের খাতিরে মিথ্যা কথা বলিতে যে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, তাহা দেখিয়াছি।"[১৬]

ঐতিহাসিক এ. এফ.এম আব্দুল জলীল ষাটের দশকের প্রথমভাগে সুন্দরবনের শেখেরটেকে ভ্রমন করতে যেয়ে যা দেখেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমরা ভ্রমণকালে বরাবর শেখের খালে মধ্য দিয়ে দুই তীরবর্তীর গভীর জঙ্গল অতিক্রম করিয়া পূর্ব দিকে প্রায় দেড় মাইল পৌছিবার পর খালের দক্ষিণ তীরে একটি প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। এখানে কয়েকটি গাব গাছ আছে, তথায় নৌকা রাখিয়া আমরা দক্ষিণ পদব্রজে গাছের ঘন গুড়ি, গুলো ও হদো বনের মধ্য দিয়ে কর্দমাক্ত পথ ধরিয়া প্রায় এক মাইল পরে একটি নগরের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। দখিতে পাইলাম। সেখানেও এক বিরাট দিঘীর চারিপাশে দূর্গের ভগ্নাবশেষ দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোনে একটি মন্দির ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। ভগ্ন অট্টালিকার স্তুপ ও মন্দিরের মধ্যে প্রায়ই ব্যাঘ্রদল আসিয়া আশ্রয় লয়। ভয় সংকুল গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এই স্থানে উপস্থিত হইলাম। শেখের বাড়ীর ন্যায় এখানেও প্রচুর বট ও গাব গাছ ইত্যাদি আছে। জলাশয় প্রচুর মৎস্যে পূর্ণ। জলাশয়ের চারিদিকে শতাধিক পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ। মন্দিরটি কোন সময় নির্মিত সঠিকভাবে কেহ বলিতে পারে নাই। মন্দিরের ইটের মাপ ৬" - ৩ X ২" এবং ছোট সাইজের টালির মত ইটও ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমের দিকে খোলা। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র এই স্থানকে রাজা প্রতাপাদিত্যের শিবসা দুর্গ অথবা মোঘল আমলে নির্মিত কোন দুর্গ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মন্দিরের অবস্থানের জন্য এই স্থান সাধারণের নিকট কালী বাড়ি বলিয়া সুপরিচিত এবং ইহার দক্ষিণ দিকের খাল, কালীর খাল নামে পরিচিত। এই স্থানকে অবশ্য কেহ কেহ কামার বাড়ীও বলে।"[১৭]

উপরোক্ত কালী বাড়ীর প্রায় এক মাইল দক্ষিণ পূর্বে এবং কালীর খালের উত্তর পারে অনেকগুলি বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানেও অনেক ইষ্টক নির্মিত বাড়ির ভগ্নাবশেষ আছে। এ অঞ্চলটি গড়ে ১০ বর্গমাইল হইবে। এককালে এখানে বহুলোকের বসবাস ও গমনাগমন ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ মগ পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য মোঘল শাসকরা এইখানে সামরিক ঘাটি নির্মাণ করেন এবং তথায় সুন্দর লোকালয় গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন। মন্দিরটি হিন্দুরাজ কর্মচারীদের জন্য নির্মিত হইয়া থাকিবে।"[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে মানিক সাহা লিখেছেন, "মুঘল সাম্রাজ্যের সময় থেকে স্থানীয় জমিদারদের কাছে সুন্দরবন অঞ্চল ইজারা দেয়া হতো। এসব জমিদারদের প্রধান কাজই ছিলো বন কেটে ফসলি জমি তৈরী ও জনবসতি গড়ে তোলা। যা বৃটিশ শাসনের ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো।"[১৯]

১.৭ গবেষনার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব

সমাজ সম্পর্কিত বিষয় গুলোকে সামাজিক বিজ্ঞান যা বিজ্ঞানের মর্যদা প্রদানের ক্ষেত্রে গবেষনার কোন বিকল্প নেই। বৈজ্ঞানিক জগৎ সাধারনত সুপরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে: তাই কোন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহন করার ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষনার কোন বিকল্প নেই। তাই কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষ করে যার সাথে সম্মাজের যোগসূত্র রয়েছে তা বিশ্লেষনের জন্য সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার আবশ্যকতা রয়েছে। কেননা সমাজতাত্ত্বিক গবেষনা হচ্ছে এমন একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে যুক্তি সঙ্গত ও সুশৃঙ্খলভাবে সমাজের নতুন ঘটনা আবিষ্কার ও অতীব বিষয়ের সত্যতা নিরুপন পরীক্ষা করা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার, ব্যাখ্যা প্রদান করা, নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারনা, তত্ত্ব ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যার মাধ্যমে মানষিক ব্যবহারের মূল্যায়ন সম্ভবপর। তাছাড়া প্রকৃতি সম্পর্কে জানার কৌতুহল মানুষের যেমন সেই আদিকাল থেকে তেমন মানব সমাজ সর্ম্পর্কে জানারও আগ্রহ অতি পুরাতন। বাস্তবিকপক্ষে প্রত্নস্থলটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে বর্তমানে বিরানভূমিতে প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। এ স্থলেই এক কালে জনবসতি ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপে স্পষ্ট মন্তব্য করা হয়েছে: পশুর ও মর্জ্জাল নদীর মধ্যবর্তী উঁচু জমিতে অবস্থিত 'শেখেরটেক' নামক স্থানের আশে পাশে শেখের খাল ও কালীর খালকে কেন্দ্র করে একটি বিস্তীর্ণ জনপদের অস্তিত্ব ছিলো। কিন্তু সে জনপদ বর্তমানে বিরান অবস্থায় আছে।[২০] তারা নির্মাণ করেছিল মন্দির এবং সম্ভবত শাসনকার্যের কেন্দ্রকে রক্ষার জন্য দুর্গও তৈরি করেছিলো। মন্দির প্রতিষ্ঠার সাথে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সুগভীর সম্পর্ক আছে। কেননা, মন্দির নির্মাণ কোনো একটা বিশেষযুগের বিশেষ কর্মতৎপরতা বা চৈতন্যের ফল নয় বরং এর সাথে জড়িত রয়েছে সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি। মন্দির নির্মাণ ও মন্দিরের স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক ড. রতনলাল চক্রবর্তী যথার্থই মন্তব্য করেছেন: দেবালয় (মন্দির) প্রতিষ্ঠার স্থান আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম যুগের দেবায়তন নগর প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। বর্তমানে জরাজীর্ণ মন্দিরকে জনশূণ্যস্থানে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখে এরূপ মন্তব্য ঠিক হবে না যে মন্দির নির্মানের জন্য স্থান নির্বাচনে কোনো পরিকল্পনা ছিল না। প্রাচীন মন্দিরের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো কোনো নদী প্রবাহের যোগাযোগ ছিল। মন্দির যখন একটা সামাজিক ও আধ্যাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তা লোকালয়ে নির্মাণের পক্ষেই যুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন করে।[২১] এছাড়া দুর্গ নির্মানের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত। সুতরাং এ অঞ্চলের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক ইতিহাস চর্চায় আলোচ্য প্রত্নস্থলের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের মধ্যে জনবসতিহীন বর্তমান শেখেরটেক প্রত্নস্থলে দু'টি মন্দির স্থাপনা একদা জনবসতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে, একই সাথে দুর্গের অবস্থান প্রশাসনিক ও সামরিক গুরুত্ব বহন করে। অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ লিখেছেন: প্রত্ন তাত্ত্বিক উৎখনন ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত প্রামাণ্য সূত্র থেকে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাতে গোটা বাংলার প্রতিচ্ছবি নেই। হিউয়েন সাঙ সমতট অঞ্চলে ৩০টি সংঘারাম প্রত্যক্ষ করা দাবি করেছেন। কিন্তু এর অধিকাংশ এখনো উন্মোচিত হয়নি। ....ভূ-প্রাকৃতিক বাস্তবতায় অনেক প্রত্নস্থল এখন আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। দূর্বল নির্মাণ উপকরণ, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ভূমিকম্প প্রভৃতি কারণে বিস্তারিত প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কারের সুযোগ সীমিত হয়ে গিয়েছে। এছাড়া এদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের একমাত্র আইনসম্মত অধিকর্তা সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নানা সীমাবদ্ধতার জন্য কার্যক্রম বিস্তৃত করতে পারছে না। এসব কারণে প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনেকটাই অনুদ্ঘাটিত রয়ে গিয়েছে।[২২] তাছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের ইতিহাসের বহুলাংশ এখনো অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। এমনি প্রেক্ষাপটে উক্ত প্রত্নস্থলে খননকার্য পরিচালিত হলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুন্দরবনের ইতিহাস পুনর্গঠনের সম্ভাবনা নিশ্চিত। বস্তত উক্ত প্রত্নস্থলের সাংস্কৃতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

১.৮ গবেষণার সময় পরিধি

সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে বিপদ সংকুল স্থানে গবেষণা ক্ষেত্রটি অবস্থিত হবার কারনে এক বছরে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই গবেষণার সময় পরিধি দু'বছর।

১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বলতে কি বুঝায় তা বুঝতে সক্ষম হয়েছে অভিসন্দর্ভ সম্পাদন করতে গিয়ে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলঃ

- সুন্দরবনের গহীনে বিপদসংকুল স্থানে গবেষনা ক্ষেত্রটি অবস্থিত। যার ফলে ইচ্ছা করলেই গবেষণা ক্ষেত্রে যাওয়া সম্ভব নয়।
- সুন্দরবনের সরু নালা দিয়ে ভিতরে প্রবেশের বাঘের আক্রমনের সম্ভাবনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- ঝড় বৃষ্টির সময় সুন্দরবনের বাঘ শেখেরটেকের কালী মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথম যে বার গবেষনা ক্ষেত্রটি পৌঁছাই তখন জানতে পারি আমরা আসার কিছুক্ষণ আগে মন্দিরে একটি বাঘ ছিলো।
- বন রক্ষীবাহিনী ছাড়া ও স্থানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অন্তত তিন জন রক্ষীবাহিনী বন্দুক সহ ওই স্থানে পৌঁছানো সম্ভব।
- বিশাল পশুর নদী মুহূর্তের মধ্যে তার রূপ বদলায় আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে। যার ফলে ছোট নৌকা বা ট্রলার ওই জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব নয়।
- সুন্দরবনের ডাকাতির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় এ জায়গা থেকে মাঝিদের অপহরণ করে নিয়ে যায়।
- কাদা মাটির মধ্য দিয়ে হাঁটার সময় বিষাক্ত সাপের ভয় রয়েছে।
- গবেষণা ক্ষেত্রটি পরিদর্শন করা বেশ ব্যয় বহুল ব্যাপার।
- তা ছাড়া সব সময় বন বিভাগের অনুমতি পাওয়া সম্ভব হয় না।
- শীতকাল ছাড়া অন্য সময় গবেষণা ক্ষেত্রে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।
- বিপদসংকুল হবার কারনে গবেষণা ক্ষেত্র অবস্থানের কোন সুযোগ নেই বরং দিনের আলো থাকতে থাকতেই ওই স্থান ত্যাগ করতে হয়।
- গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়েছে।
- খননকাজ পরিচালনা করলে শেখের টেকের আর্থসামাজিক চিত্র সহজেই উন্মোচন করা সম্ভব হতো।
- প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবলের অভাবে বিদ্যমান ছিলো।
- গবেষণা কর্মটি নিয়ে তেমন কোন কাজ না হবার কারনে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ বেশ সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ সুন্দরবনে সভ্যতার ইতিহাস

ভারতবর্ষ শুধু নয়, বিশ্বের দীর্ঘতম নদী গঙ্গার অববাহিকার সর্বশেষ এবং সর্বনিম্ন অঞ্চলের প্রাচীনতম সভ্যতার সূত্রপাত, বিকাশ, পরিণত অবস্থা এই তিনটি যুগকে ধরতে গেলে যেসব গবেষণা দরকার, তা এখনও হয়ে ওঠেনি এখানকার আদিমবাসী মানবগোষ্ঠীসমূহের যথাযথ অনুসন্ধানের অভাবে। বিভিন্ন সময় বহু জনগোষ্ঠীর আগমন, আগ্রাসন, আবাসন প্রক্রিয়ায় এখানকার প্রাচীনতম সভ্যতার সৃষ্টি ও প্রসারণ ঘটেছিলো। তবে সিন্ধু সভ্যতার পরিণত যুগকে খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দ নাগাদ ধরে, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সভ্যতার সঙ্গে কিছুটা যোগসূত্রের সন্ধান মিলছে আধুনিক গবেষণায়। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থের আংশিক তথ্যের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলো যেন অন্তর্হিত হতে থাকে। পরবর্তী কালের সন্ধানে দেখা গেল, হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়োসহ সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রস্থলগুলো বহিরাগত আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিলো বিতাড়িত বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়েছিলো ভারত বর্ষের অভ্যন্তরে। সমকালীন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, কোন এক হিংস্র আক্রমণের ফলে সিন্ধু সভ্যতার অবসান ঘটেছিলো। আবিস্কৃত বহু ক্যালিব্রেটেড কার্বন তারিখের সাহায্যে এই সভ্যতার অবসানের সময়কাল নির্ণীত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছরের সমসাময়িককালে। এর অন্তত ৫০০ বছর পরে প্রাচীনতম বৈদিক গ্রন্থ ঋগ্বেদের রচিত হয়েছিলো। ইতিহাসের এই জটিল আলো-আঁধারি প্রেক্ষাপট এখনও সম্পুর্ণ উন্মোচিত হয়নি। তবে সিন্ধু সভ্যতার অবসানের পর সারা ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কৃষিভিত্তিক সভ্যতার যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছিলো, সেই সূত্রে নিম্ন গাঙ্গেয় সুন্দরবন সভ্যতার পরিণত যুগের ঐতিহাসিক পরিচয় আমাদের হাতে এসেছে অনেক পরে। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পর মেঘাস্থিনিসের ভারত বিবরণ সূত্রে প্রাচীন পুন্ড্রদেশে ও রাঢ়দেশের মধ্যবর্তী গাঙ্গেয় সমভূমির গঙ্গারিডি সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রস্থলের পরিচয় আমরা পেয়েছি গ্রিক-রোমান নাবিক, পর্যটক, ভূগোলবিদ, ভার্জিলের মতো মহাকবির বর্ণনায়। আমাদের দেশের ইতিহাসবোধের অভাব আমাদের পূর্ণ করতে হয়েছে বিদেশিদের দেওয়া তথ্য সম্ভারে। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার বুকে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারতা সুন্দরবন সভ্যতাকে বিশ্বব্যাপী করেছিলো। সুন্দরবন সভ্যতার আদি যুগকে আমরা অবশ্যই নিম্নগাঙ্গেয় সভ্যতা বলবো, বিদেশীদের চোখে যা ছিলো গঙ্গারিডি সভ্যতা পরিচয়ে চিহ্নিত।

সিন্ধুসভ্যতার অবসানের পর প্রাচীনতম ভারতীয় আদিমবাসী কৃষককুলের আগমনে গড়ে ওঠা কৃষিভিত্তিক সভ্যতার স্থরটি গঠিত হয়েছিলো নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমিকে কেন্দ্র করে। রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশ থেকে করতোয়া নদীতীর

Dhaka University Institutional Repository

ঘেঁষে কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার পত্তন ও প্রসার ঘটেছিলো গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনার মধ্যবর্তী উর্বর পলিমাটির বুকে। তবে সভ্যতার মেরুদন্ড স্বরূপ ছিলো গঙ্গা নদী। সিন্ধু সভ্যতাকে সিন্ধুনদের দান বলে স্বীকার করি বলেই, এই নিম্ন গাঙ্গেয় সভ্যতাকে অবশ্যই গঙ্গা নদীর দান বলতেই হয়। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির পরিমন্ডল চিহ্নিত করা হয়- দার্জিলিং পার্বত্য ভূমি ও পুরুলিয়ার প্রাচীন ভৌগলিক অবস্থান বাদে রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগরের তটভূমি পর্যন্ত। ভূতত্ত্ববিদদের আধুনিক যুগের পরিমাপে আনুমানিক ৮১,০০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত বিস্তীর্ণ এই ভূভাগকে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়–১. উত্তর বঙ্গ (প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুন্ড্রদেশ), ২. রাঢ় সমভূমি এবং ৩. বদ্বীপ অঞ্চল বা সুন্দরবন। ভূতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে রাঢ়ভূমির অর্থাৎ প্রাচীন সুহ্মের সম্প্রসারণের ফলে গঙ্গা নদীর পূর্ব অববাহিকায় প্রথমে পুন্ড্রদেশ এবং পরে বঙ্গ, সমতট ইত্যাদি সমভূমি গঠিত হয়েছিলো। আদিমযুগের অরণ্যাঞ্চল ভূভাগ হাসিলের পর এখনকার ''কুমারী ভূমিতে'' ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিলো সুহ্ম-রাঢ়, পুন্ড্র ও বঙ্গ সভ্যতার বুনিয়াদ। পরিবেশবিদ্যার আলোকে বোঝা গেছে, মৌসুমী বায়ুর অকৃপণ সহায়তায় অনুকুল প্রাকৃতিক পরিবেশে মরসুমী ফসলের প্রাচুর্য কৃষিজীবী মানুষের উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছিলো। সিন্ধু সভ্যতার ক্ষেত্রে এমন সুযোগ খুব বেশি ছিল না। এক সময় নদীগুলো স্রোতপথ হারাতে বসায় কৃষককুল উৎপাদনে মার খাচ্ছিলো। এমন সময়কালে পশ্চিম প্রান্ত থেকে বহিরাগত আর্যদের আক্রমনে বিপর্যস্ত আদিমবাসী কৃষককুল প্রথমে উচ্চগাঙ্গেয়, পরে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকা ছড়িয়ে; সবশেষে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিতে কৃষি উপনিবেশ গড়েছিলো। তাম্রযুগের পর লৌহযুগের দ্রুত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লাঙলের ফলার উন্নত প্রযুক্তিতে রাঢ়, পুন্ড্র ও বঙ্গ জাতিবাচক দেশগুলোতে কৃষি উৎপাদনে যুগান্তর ঘটে গিয়েছিলো।

পূর্বভারতের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, পরিবেশবিদ্যা ও লিপিতত্ত্বের আদিপর্ব জুড়ে আছে এইসব কৃষিজীবী, জলজীবী, জঙ্গলজীবী প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর ব্যাপক পরিচয়। সিন্ধু সভ্যতার যুগের অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় সভ্যতার মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে রাঢ়, পুন্ড্র, কামরূপ, বঙ্গ সভ্যতার নাম পরিচয় প্রথম প্রথম নতুন নতুন মনে হলেও এইসব আদিমবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের প্রাচীনতম নাম পরিচয় নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। সুন্দরবন সভ্যতার আদিকান্ডের প্রধান অধ্যায়গুলোর সঙ্গে পুন্ড্র আদিমবাসী জনগোষ্ঠীর বিশেষ যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। অখন্ড সুন্দরবনের বাখরগঞ্জ খুলনা ও চব্বিশ পরগণার সমগ্র নিম্নাঞ্চল জুড়ে যেসব জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় মিলেছে; তার মধ্যে প্রধানত খুলনা ও চব্বিশ পরগণা জুড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসেবে পুন্ড্রদেশের পুন্ড্রজাতির পরিসংখ্যান আমাদের হাতে এসেছে। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নমঃশুদ্র, কপালি, কৈবর্ত ইত্যাদির নামেও আছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সুন্দরবনের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক এক আলোচনায় মোঃ বদরুল আনম ভূঁইয়া লিখেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

"পৌন্ড্রক্ষত্রিয় এবং নমঃশুদ্র জাতের লোকেরা জঙ্গল কেটে মাটি তুলে নিম্নস্থানকে উঁচু করে সুন্দরবনের বহু স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলো। সুন্দরবন ভ্রমণে বহু স্থানে পুকুর, বাঁধ, ঘাট, দূর্গ, মন্দির, বসতবাটির চিহ্ন পাওয়া যায়। সাধারনত গ্রামাঞ্চলে যেসব বৃক্ষ পাওয়া যায় সেগুলো সুন্দরবনে পাওয়ার কথা নয়। সুন্দরবনের ভিতরে যেহেতু বিভিন্ন স্থানে গাব, জাম, বট, জিওল প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়, এই সমস্ত বৃক্ষ দেখে বোঝা যায় যে, মানুষ দ্বারাই ওই সকল বৃক্ষ এককালে রোপিত হয়েছিল। সুন্দরবনের প্রাচীন কীর্তিসমূহের ভগ্নাবশেষ এখনও বহু স্থানে বিদ্যমান, এখনও বহু স্থান মানুষের অগম্য রয়েছে।"[২৩]

ইতিহাস রচনায় পাথুরে প্রমাণ খুঁজে, সংরক্ষণ করে, বিশ্লেষণ করে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মানতে হয়। আধুনিক যুগে এই পদ্ধতিতে ইতিহাসের শক্ত বুনিয়াদ গড়া হচ্ছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় এই পদ্ধতিটি সৌধনির্মাণের ইট, কাঠ, পাথরের মতো। অপরিহার্য হলেও সব নয়। ঐতিহাসিক একজন দক্ষ কারিগরের মতো নিজের প্রয়োজন মতো গ্রহণ ও বর্জন করে নেন। মানুষকে, মানুষের গড়ে তোলা সমাজকে মানুষের সভ্যতাকে ধরতে গেলে মানুষের ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রীয় পরম্পরকে ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে ইতিহাসের সৌধ গড়েন। বর্তমানকালের আপাততুচ্ছ বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, ছিন্নপ্রায় সমাজ-কাঠামো; দারিদ্র-পীড়িত, লাঞ্ছিত, দলিত মানুষের ধর্মসংস্কার, আচার-আচরণের মধ্যে মেলে কোন এক নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের বৃহৎ জীবনের ইতিহাস-উপকরণ। পাশাপাশি এও ভাবা দরকার যে, পাথুরে উপকরণও নির্মিত হয়েছিলো মানুষের আবেগ, বিশ্বাস, ঘাম, রক্ত এবং উন্নত মনস্কতার ছোঁয়ায়। সেই জন্যই যথাযথ ইতিহাসের জন্য মানুষের বসবাসস্থানের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষের জীবিকা, জাতি-গোষ্ঠীর পরিচিতির উপকরণ দরকার। এরই মধ্যে বারবার বদলে যাওয়া ভৌগলিক পরিমন্ডলে মানুষের জীবনযাত্রাও পরিবর্তিত হয়েছে। সেই জন্য আবহমানকালের বিচিত্র মানবগোষ্ঠী সমূহের পরিচিতির অনুসন্ধান অনিবার্য।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র মোহনা মধ্যবর্তী বাখরগঞ্জ (বরিশালের দক্ষিণ অঞ্চল বিভাগ) খুলনা (যশোহরের দক্ষিণ প্রান্ত অঞ্চল) এবং চব্বিশ পরগণার নিম্ন প্রদেশ জুড়ে মানুষের গড়ে তোলা প্রাচীনতম সভ্যতার নাম সুন্দরবন সভ্যতা। প্রাচীনও মধ্যযুগে নামকরণের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। তবে সুন্দরবন সভ্যতার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ অর্থাৎ ইছামতী-রায়মঙ্গল মোহনা থেকে গঙ্গাসাগর মোহনা পর্যন্ত সুবিস্তৃত নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমির ইতিহাস পূর্বাংশের থেকে প্রাচীনতর। আমরা এখন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৈদিক সাহিত্যের উপকরণ, বৌদ্ধপূর্ব যুগের মহাকাব্যিক উপকরণ, বৌদ্ধযুগের পুথিগত উপকরণ, মৌর্যযুগের ঐতিহাসিক বিবরণ এবং করতোয়ানদী তীরের মহাস্থানগড় প্রত্নস্থলে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত পুন্ডনগল বা পুন্ড্রনগর নামে উৎকীর্ণ সম্রাট অশোকের শিলালিপির উপাদান বিশ্লেষন করে প্রাচীন সুন্দরবন সভ্যতার মানবগোষ্ঠী সমূহের আলোচনায় ইতিহাসের জটিল অধ্যায়গুলো আলোকিত করার চেষ্টা করবো।

ইতিহাস হলো অতীতের সঙ্গে সমকালের কথালাপ। এই কথালাপ হয় অতীত মানব সন্তানদের সঙ্গে আধুনিক সজীব উত্তরাধীকারীদের মধ্যে। মাটির বুকে ঘটে যায় বহু পরিবর্তন। সেই জন্য অনুসন্ধান বহুলাংশে দুরূহ হয়ে ওঠে। আধুনিক সুন্দরবনের মাটি জল, জঙ্গল, জনপদ দেখে এর প্রাচীনত্ব অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে- এখানকার মানুষের পরিচয়, তাদের জীবিকার পরিচয়, ধর্ম সংস্কারের পরিচয় মিলছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের। তাম্রশ্মীয় ও লৌহযুগের পর্ব পেরিয়ে মোর্য-পূর্ব যুগের ইতিহাসের জটিল অধ্যায়গুলিতে সুন্দরবন সভ্যতার মানুষদের যেসব পরিচয় পাওয়া গেছে, তা পূর্বভারতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিম্নগাঙ্গেয় সম্প্রসারিত সমভূমির বিস্তৃতি ছিলো পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের নিম্নাংশের মেঘনা নদীর অববাহিকা জুড়ে। এই সব ভূ ভাগ পরবর্তীকালে বর্দ্ধিত পুন্ড্রবর্ধন ভূক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। আর্য অনুপ্রবেশের বহু পূর্বে আর্যজাতি ও আর্য ভাষাভাষীদের কাছে এখানকার মানবসভ্যতার ধারক ও বাহকদের পরিচয় ছিলো অশ্রুতপূর্ব। আর্যবর্তের বাইরের এই মানব পরিমন্ডলের প্রতি আর্যদের অবজ্ঞা ছিলো সীমাহীন। প্রথম অবজ্ঞাসুচক পরিচয় মিলেছে প্রাচীনতম বৈদিক গ্রন্থে। এখানকার মানুষের সর্ব প্রথম পরিচয়ের উল্লেখ আছে ঋগ্বেদের "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭-১৮) গ্রন্থে। বহুলস্বীকৃত কালপঞ্জি অনুসারে সিন্ধু সভ্যতার লুন্ঠনকারী হিসেবে আর্যদের গণ্য করা হয়। খ্রিস্ট পূর্ব ১৭৫০ অব্দের মধ্যেই এদের অভিবাসন শুরু হয়েছিল এবং কাবুল আর গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ১৫০০-১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে ঋগ্বেদের সংহিতা অংশগুলি সংকলিত হয়েছিলো। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" অংশের সংকলনের সময়কাল ধরা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে ৯০০ অব্দের মধ্যে। আধুনিক সুন্দরবনের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুন্ড্রজাতির প্রথম পরিচয় সংকলিত হয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের শুনঃশেপ উপাখ্যানে। সেখানে পুন্ড্রগণকে বলা হয়েছে দস্যু। এরা ছিল অন্ধ্র, শরব, ও পুলিন্দ জাতিগুলির সমতুল্য। নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমির পুন্ড্রজাতির ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায় গঙ্গা মোহনা প্রদেশ থেকে খুলনা জেলার নিম্নাঞ্চল জুড়ে। এই আদিমবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আধুনিক যুগে সুন্দরবন নামে চিহ্নিত মানব সভ্যতার আছে নিবিড় সম্পর্ক। বৈদিক যুগের শেষ অধ্যায়; আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালের (খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দ) মধ্যে ব্যবধান অন্তত ৫০০ বছরের বলে মনে করেন প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক এ. এল. ব্রাশাম। এই মধ্যবর্তী ৫০০ বছরের জটিল অধ্যায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের কাল্পনিক ও আধা-ঐতিহাসিক

Dhaka University Institutional Repository

যুগের অবস্থানকাল বলে ধরা হয়ে থাকে। সুন্দরবন সভ্যতার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিবর্তন ধারার মধ্যে আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান দরকার।

নিম্ন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ভূখন্ডটি সুন্দরবন নামে চিহ্নিত হয়েছে অর্বাচীনকালে। এর প্রাচীনতম ভৌগলিক অবস্থান ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস নির্ণয়ের চেষ্টাও শুরু হয়েছে আরও অনেক পরে। ঔপনিবেশিক যুগের সূচনার শতবর্ষ পেরিয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রথাগত ইতিহাস রচনার সূচনা হলেও আজও এর প্রাথমিক মাছ ঘুচছে বলে মনে হয় না। ১. পুরাতত্ত্ব, ২. ভূ-তত্ত্ব, ৩. নৃতত্ত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ ইতিমধ্যে হয়েছে সীমিত দৃষ্টি ভঙ্গিতে। বাকি আছে আরও বেশ কিছু। জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব পরিবেশবিদ্যা, লোক বিদ্যার দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ সুন্দরবন ইতিবৃত্ত রচনার কাজ আমাদের আরও করা দরকার। ভূতত্ত্বের চোখে সুন্দরবন বদ্বীপ অঞ্চলের জন্ম বেশি দিনের নয়। ভূতত্ত্ববিদ নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, এই সে দিন হল সমুদ্রগর্ভে পরি জমে এই স্থলভাগের সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে এই ভূ-ভাগে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছে। ভূতত্ত্বের এই সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে না বিচার বিশ্লেষণ করে বিশ শতকের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত ইতিহাস গবেষকরাও সহজেই বলে দিতেন, সুন্দরবন অঞ্চলের বিশেষ কোন প্রাচীন ইতিহাস নেই। এই বিষয়ে অনেকেই ভুল করে বসেছেন ভূতত্ত্বের চোখে সুন্দরবন নামে চিহ্নিত প্রাচীন জীবপরিমন্ডলের ইতিহাসের কালসীমা নির্ধারণে। ভূতত্ত্বের চোখে লাখ লাখ বছরের ভূমিস্তর খুব প্রাচীন নাও হতে পারে, কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নয়। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, প্রায় পনের থেকে কুড়ি লাখ বছর আগে প্লাওসিন যুগে গাঙ্গেয় সমভূমির ভূমিস্তর গঠিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বের থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম সুন্দরবন অংশ অর্থাৎ বর্তমানকালের ভারতীয় সুন্দরবন অংশ প্রাচীনতম। ভূ-তাত্ত্বিক ওল্ডহাম মনে ভেবেছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে সুদুর অতীতে ছোট ছোট পাহাড় ছিলো। ভূমিকম্পে বহুবার অবনমনের ফলে বিলীন হয়েছে ভূগর্ভে। সুনামিতে বিপর্যস্ত হয়েছে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তের মাটির তলা থেকে আবিস্কৃত প্রত্নসম্পদ আবিষ্কারের পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে মৌর্যযুগ থেকে।

ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের পুথিগত উপকরণের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। বৈদিক গ্রন্থের পরবর্তীকালে রচিত ও সংকলিত দেশীয় শাস্ত্র, সাহিত্য, মহাকাব্য, ব্যাকরণ; অর্থশাস্ত্র; বিদেশি রাজদূত, পর্যটক, নাবিক, ভূ-গোলবিদ এবং ঐতিহাসিকদের বিবরণী, প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ এবং আরও পরবর্তীকালের কালিদাসসহ সংস্কৃত ভাষার কবিদের কাব্য-সাহিত্য অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্য, শ্রীচৈতন্য জীবনীমূলক কাব্য,

Dhaka University Institutional Repository

পুথি-পাঁচালি, পালাগান, মুসলমানী কেচ্ছা-কাহিনি ইত্যাদি থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। আবিস্কৃত ও সংগৃহিত উপাদান থেকে বোঝা যাচ্ছে বঙ্গোপসাগর উপকুলবর্তী এই ভূভাগ যুগে যুগে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়েছে, যথা- পাতাল, রসাতল, পুন্ড্রবর্ধন, বঙ্গাল, চন্দ্রদ্বীপ, ব্যাঘ্রতটীম মন্ডল, হরিকেল ইত্যাদি বিভিন্ন নামে। সর্বত্র দেখা যাচ্ছে আদিম যুগ থেকে মানুষ এখানে বসবাস করে আসছে। রামায়ণে উল্লেখিত মহর্ষি কপিলের সাধনক্ষেত্র গঙ্গাসাগরধামের বাস্তবক্ষেত্র সমকালের গঙ্গাসাগরদ্বীপ। মহাভারতের সভাপর্বে ভীমের দিগ্বিজয়ে সমুদ্রোপকুলবর্তী এই ভূখন্ডকে বলা হয়েছে ম্লেচ্ছদের বাসভূমি। বিভিন্ন পুরাণ কাহিনিতে এই গাঙ্গেয় সমভূমির মানুষদের- নাগ, রাক্ষস, অসুর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। রামায়নে অরণ্যাঞ্চলের মানুষদের বানর ও হনুমান সাজান হয়েছিল। আর্যগন্ধী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মুখের বুলিতে, শ্রুতিতে এবং হাতের কলমে আদিমবাসী ভারতীয়দের প্রকৃত পরিচয় আজও হয়ে আছে মসিলিপ্ত। সেই জন্য মানুষের আবহমান কালের পরম্পরার মাঝে খুঁজতে হবে সুন্দরবন সভ্যতার ইতিহাস। এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে আবর্তিত মানুষের জীবন, জীবিকা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় মানুষের উপস্থিতি বড় করে চোখে পড়ে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে নিম্ন গাঙ্গেয় উপকুলভাগের যে সব পরিচয় এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে এসেছে এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে ধরা পড়েছে, তার বিশাল অধ্যায় জুড়ে আছে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংস্কৃতির পরিচয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অষ্ট্রিক ভাষাভাষীর সঙ্গে পুন্ড্র ও রাঢ়ের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সংমিশ্রণে করতোয়া নদী অববাহিকার পুন্ড্রনগর থেকে মৌর্যযুগের গঙ্গে বন্দর অবধি যে সভ্যতার বিস্তার আমরা জানতে পেরেছি, তাকে সুন্দরবন সভ্যতার আদি-ঐতিহাসিক যুগ বলে চিহ্নিত করতে হয়। এই যুগের দেশনামগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে গেছে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে উল্লেখিত পুন্ড্র দেশনাম এবং এর প্রায় দুশো বছর পরে সংকলিত 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে উল্লেখিত বঙ্গ দেশনামের সূত্র ধরে বোঝা যাচ্ছে এইসব দেশনামগুলো ছিলো জাতিবাচক দেশনাম। এই সব দেশনামগুলোর উৎস্য প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,"এহ নামগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোই হচ্ছে জাতের নাম, জাতের নাম থেকে দেশের নামকরণ খুবই সাধারণ প্রথা। রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, পুন্ড্র-আর 'কামরূপ, কম্বোজ, কামতা, কুমিল্লা' প্রভৃতি নামের 'কোম' বা 'কম' শব্দ এ গুলো আর্যভাষার পদ নয়। এগুলো হচ্ছে অনার্য জাতির নাম, তাদের নাম থেকে তাদের অধ্যুষিত প্রদেশের নামকরণ হয়েছে। তুলনীয়-'আসাম', 'অসম' বা 'অহম' জাতি।'[২৪] ব্রাহ্মণযুগের অবসানের পর আনুমানিক রামায়ণ ও মহাভারতীয় যুগের পরবর্তীকালকে সুনীতিকুমার বুদ্ধযুগ বলেছেন। বুদ্ধযুগ থেকে অশোক পরবর্তী মৌর্যযুগের

Dhaka University Institutional Repository

অবসানের পর পর্যন্ত রাঢ়দেশ ও পুন্ড্রদেশে আর্যভাষা প্রবেশ করেনি। বঙ্গদেশ তো দুরস্থ। বঙ্গদেশ বলতে প্রাচীনকালে, বর্তমানকালের 'ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলকেই বঙ্গদেশ' বলত।[২৫] খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে সুহ্ম-রাঢ় ও পুন্ড্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিলো ব্যাপকভাবে। ধীরে ধীরে বঙ্গদেশে এই ধর্মবিপ্লবের সম্প্রসারণ ঘটেছিলো। মৌর্য পূর্ব যুগে পুন্ড্রদেশ ছিলো পূর্বভারতের সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এই পুন্ড্রদেশ গাঙ্গেয় অববাহিকা ধরে ধরে সোজা দক্ষিণে গঙ্গাসাগর মোহনা প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো। কৃষিভিত্তিক নিম্নগাঙ্গেয় সভ্যতা যে ধীরে ধীরে শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে ওঠেছিলো তার প্রমাণ মিলেছে। হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে যেমন মেসোপটেমিয়া সভ্যতার যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, তেমনই পুন্ড্রদেশের রাজধানী পুন্ড্রনগরের সঙ্গে নদী ও বঙ্গোপসাগর জলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্যাম, সুমাত্রা ও জাভা প্রভৃতি দেশে এবং পশ্চিমে ব্যাবিলন ও মিশরের সঙ্গেও ব্যবসায় বাণিজ্য চলতো। এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিলো বৌদ্ধযুগ অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের বহু আগে। উল্লেখিত পুন্ড্রধিপ পৌন্ড্রক বাসুদেবের শৌর্যগাথা এবং কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিষয়ে ভাবার অবকাশ আছে। আর্যবর্তের দিগ্বজয়ীদের বিরুদ্ধে পৌন্ড্ররাজ বাসুদেব, তাম্রলিপ্তরাজ, বঙ্গরাজদের প্রতিবাদী চরিত্রের ঐতিহাসিকতা বিষয়ে আরও বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ কৃষিভিত্তিক দেশ সমূহের বুকে গড়ে ওঠা শিল্প-বাণিজ্যের যে সব চিত্র পরবর্তী খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গঙ্গারিডি সভ্যতার যুগে আমরা পেয়েছি বিদেশিদের বিবরণ, রচনা, সাহিত্যে এবং মানচিত্রে, তার বুনিয়াদ গড়ে ওঠেছিলো প্রাগৈতিহাসিক সুহ্ম-রাঢ়দেশে ও পুন্ড্রদেশে। পুন্ড্রনগর রাজধানী থেকে বর্ধিত পুন্ড্রবর্ধনের সীমানা একসময় গঙ্গার মোহনা থেকে মেঘনা নদীর মোহনা পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিলো। এই প্রদেশে বাণিজ্যকেন্দ্রের ব্যাপক পরিচয় পাওয়া গিয়েছে বৌদ্ধ গ্রন্থে। বুদ্ধের পুন্ড্রদেশে অবস্থানের সংবাদও মিলেছে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পর থেকে মৌর্যযুগের সুচনা কাল পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান প্রায় দুশো বছর। মেগাস্থিনিসের বিবরণ আমাদের হাতে এসেছে এবং এই সূত্রে গ্রিক-রোমান নাবিক, ভূগোলবিদ, পর্যটক, লেখক, কবিদের বর্ণানায় পূর্বভারতের প্রাচীন গঙ্গারিডি জাতি ও দেশের পরিচয় মিলেছে। এই গঙ্গারিডি জাতির দেশকে খুব সহজেই প্রাচীন পুন্ড্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। বর্তমান কালের বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জুড়ে ছিলো পুন্ড্রবর্ধন নগর রাজধানী পুন্ডনগল বা পুন্ড্রনগর। পরবর্তীকালে পুন্ড্রনগর মহাস্থানগড় নামে চিহ্নিত হয়। মৌর্যযুগের প্রাজীনতম ও একমাত্র পাথুরে প্রমাণ আবিস্কৃত হয়েছে এই সুপ্রাচীন পুন্ড্রভূমিতে।[২৬] বঙ্গদেশে প্রাপ্ত বলে যে প্রচার চালান হয়, সে বিষয়ে এবার আরও সচেতনতা দরকার। এই মহাস্থানগর থেকে সাগর মোহনার গঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো পুন্ড্রদেশের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য। পুন্ড্রজাতি অধ্যুষিত এই দেশ বৌদ্ধধর্ম প্লাবনে ভেসে গিয়েছিলো।

সুন্দরবন সভ্যতার প্রধান ও বাহক এক সময় পর্যন্ত ছিলো পুন্ড্রজাতি ও পুন্ড্রদেশ। পুন্ড্রজাতি ও পুন্ড্রদেশের সীমানা ও ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে ইতিহাস চর্চার আদিগুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতামত গ্রহণ করে এগিয়ে যাওয়া দরকার। বঙ্গদর্শন, পত্রিকায়, ১২৮০ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' প্রবন্ধে তিনি বিস্তৃতভাবে লিখেছেন, "বঙ্গ, পুন্ড্র, হইতে একটি পৃথক রাজ্য ছিলো। এক্ষণে বাঙ্গালাতে ঢাকা বিক্রমপুর, অঞ্চলকেই বঙ্গদেশ বলে- সেই প্রদেশকেই প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ বলিত। কিন্তু অগ্রে পুন্ড্র, পরে বঙ্গ। মহাভারতের সভাপর্ব আছে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুন্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজা রাজ্য, এই দুই মহাবল মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েস্থ সাঙ ভারতবর্ষে এই পুন্ড্র বা পৌন্ড্রদেশে আসিয়াছিলেন।"[২৭] সেই দেশের রাজধানীর নাম পৌন্ড্রবর্দ্ধন জেনেরল কানিঙহাম বলেন যে, আধুনিক পাবনাই প্রাচীন রাজধানী পৌন্ড্রবর্ধন। অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পূর্বে পৌন্ড্রদেশ বলিত। মনুর শেষোদ্ধৃত বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এদেশ ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই বা আর্যজাতি আইসে নাই।.... সমুদ্রতীর হইতে পদ্মা পর্যন্ত প্রদেশে এক্ষণে বহু সংখ্য পুঁড়া ও পোদ জাতীয়ের বাস আছে। পুঁড়া শব্দটি পুন্ড্র শব্দের অপভ্রংশ রোধ হয়; পোদ শব্দও তাহাই বোধ হয়। অতএব এই পুঁড়া ও পোদ জাতীয়দিগকে সেই পৌন্ড্রদিগের বংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মস্তকাদির গঠন তুরানি, ককেশীয় নহে। তবে ককেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া কতক কতক তদনুরূপ হইয়াছে। জাতিবিদ পন্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষের আদিমবাসীরা সকলেই তুরাণীয় ছিলো আর্য্যেরা তাহাদিগকে পরাস্ত করায় তাহারা কতক কতক বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে।" আধুনিক কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি সেই আদিম জাতি। আর কতকগুলিন, জেতাদিগের আশ্রয়েই তাহাদিগের নিকট অবনত হইয়া রইল। আধুনিক অনেক অপবিত্র হিন্দুজাতি তাহাদিগেরই বংশ। পুঁড়া এবং পোদগণকে সেই সম্প্রদায়ভূক্ত বোধহয়।"[২৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত বহুলাংশে সত্য। পুন্ড্র দেশের অভ্যুত্থানের ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক যুগের। বহিরাগত আর্যদের সঙ্গে পুন্ড্র, রাঢ়, বঙ্গ, কলিঙ্গ ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব-পরাজয় এক সময়ে নয়। আর্যাবর্তে এসে বসবাসের আগে এদের দ্বন্দ্ব সিন্ধুসভ্যতার যুগ থেকে। আর্যাবর্তে অথবা তার নিকটবর্তী প্রদেশে বসে বৈদিক গ্রন্থ সংকলন কালে প্রথমে পুন্ড্র এবং পরে বঙ্গের উল্লেখ আছে। পরবর্তী রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে পুন্ড্রশক্তির যেসব পরিচয় আমরা

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছি এবং মৌর্যযুগের গঙ্গারিডি সভ্যতার যুগের নিম্নগাঙ্গেয় পুন্ড্রদেশের বিবরণ মিলেছে বিদেশি পর্যটক, ভূগোলবিদ, রাজদূত, কবি, নাবিকদের বিবরণীতে; তাতে, আর্যবিজয়ের ইতিহাস স্বীকৃত নয়। পূর্ব ভারতে আর্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গুপ্তযুগ থেকে। গুপ্ত-পূর্ব যুগ পর্যন্ত নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমির বৌদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির আলোচনায় এবার সুন্দরবন সভ্যতার আদি ঐতিহাসিক যুগের বৌদ্ধসভ্যতার আলোচনায় আসছি। গ্রামের বাইরে একটি উঁচু ঢিবি নাম মঙ্গলপোতা। ১৮৮৯ সালে ২০ জুন থেকে উৎখননে বেরিয়ে আসা মহাবিহারের চৈত্যাবক্ষের আকৃতি বা রূপ পর্যালোচনা করে পুরাতাত্ত্বিক এটিকে প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন।[২৯]

466825

আধুনিক যুগের সুন্দরবন সভ্যতার ধারক ও বাহকদের প্রসঙ্গে বলতে গেলেই সভ্যতা সম্বন্ধে ইতিহাসবিদদের সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। সভ্যতা বলতে আমরা কেবল তথাকথিত উন্নত, প্রচার কৌশলী, স্বপ্রদর্শনকারী সংস্কৃতি-সচেতন মানুষজন বুঝব না। বিশ্বের বৈচিত্রপূর্ণ মানবগোষ্ঠীসমূহের সমাজবদ্ধভাবে বেঁচে থাকার বিভিন্ন ধরণ আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ জীবিকা অর্জন করে, খাদ্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করে এবং বাসস্থান নির্মাণ করে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর থাকে জীবনের ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভালোবাসা এবং বর্ণময় সাংস্কৃতিক চেতনা। বিনোদনের বৈচিত্রময় অভিব্যক্তি। গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে পারস্পরিক বৈবাহিক সূত্রের বৃহত্তর সামাজিক বন্ধন। এই সব কিছুই নিয়ে গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র জীবনযাপনের ধারা। এইসব মানব সন্তানদের সামাজিক, শিক্ষাগত, কারিগরি দিকগুলো অনেকেই আপাতদৃষ্টিতে পশ্চাৎপদ, অমার্জিত আখ্যা দিয়ে নিজেদের উঁচুস্তরের জীব ভাবতে ভালোবাসে। একটা দেশের জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে এটা অন্তরায় তা এখনও ভাবতে শেখেনি বেশিরভাগ সুবিধাভোগী ও অথচ সংখ্যালঘিষ্ট জনগোষ্ঠী। সুন্দরবনের কৃষিজীবী, জলজীবী, জঙ্গলজীবী ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এখনও তথাকথিত ভদ্রলোকদের অবজ্ঞার বহর দেখে বিস্মিত হতে হয়। কথায় কথায় এদের অনেককে এখনও সুন্দরবনের শ্রমজীবী মানুষকে- লেটো, আবাদে, বুনো বলে গালাগালি দিতে দেখা যায়। ভাবতে হয়- এরা আবার কবে মানুষ হবে।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে নবাবী শাসনের অবসান ও ইংরেজ প্রভূত্ব কায়েমের সময় থেকে সুন্দরবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতির স্তরে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। রাজস্ব আদায়ের লক্ষে জঙ্গল হাসিলের ফলে কৃষি জমির সন্ধানে সুন্দরবন অঞ্চলে আসতে থাকে বিভিন্ন স্তরের মানুষ। জমিদার, লাটদার, চকদারেরা প্রতিবেশী বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর, রাঁচি ও হাজারিবাগ থেকে আদিবাসী মানুষদের আশ্রয়, বাসস্থান ও চাষযোগ্য জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুন্দরবন হাসিলের জন্য নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আসেন। এই সব সাঁওতাল, ওঁরাঙ, হো, ভূমিজ ইত্যাদি শ্রমজীবী উৎপাদক শ্রেণির মানুষের কঠোর শ্রম ও আবাদি জমির প্রতি গভীর মমত্ববোধের ফলে সুন্দরবনের উর্বরভূমি শস্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এঁরা এখন লোকায়ত সমাজের স্রোতে মিশে সুন্দরবন অঞ্চলে বৃহত্তর সমাজদেহ নির্মাণে শরিক হয়ে গেছেন।[৩০] অখন্ড চব্বিশ পরগণা জেলা ১৯৮৬ সালের ১লা মার্চ হয়েছে দ্বিখন্ডিত। দক্ষিন চব্বিশ পরগনার ১১টি থানা যথা- গোসাবা, বাসন্তি, ক্যানিং জয়নগর, মথুরাপুর, কুলতলি, রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, কাকদ্বীপ ও সাগর এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, মীনাখাঁ, হাড়োয়া ও সন্দেশখালি এই ৫টি থানা মিলে মোট ষোল থানার বিশাল ও বিস্তীর্ণ বদ্বীপ অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলে প্রধানত চারটি জীবনস্রোত মিলেমিশে সুন্দরবন সভ্যতার আবহমানকালের উত্তরাধিকার বহন করছে। ১) নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমির প্রাচীনতম পুন্ড্রবর্ধনবাসী পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয় নামে পরিচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, নমঃশুদ্র, জেলে কৈবর্ত, চাষী কৈবর্ত (মাহিষ্য), কাওরা, বাগদি, দলুই, তীওর (রাজবংশী), কুম্ভকার, কর্মকার, ধোবা, তিলি, পাটনি, সদগোপ, সচ্চষী, স্যাকরা, গোয়ালা বা যাদব,তন্তুবায়, মুচি বা চামার, হাড়ি, নাপিত, ডোম, যুগী, শুঁড়ি, পতিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি এবং জনসংখ্যায় উল্লেখযোগ্য মুসলমান এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়। ২) বিহার থেকে আগত ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীসমূহ। ৩) তৃতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে হুগলি-ভাগীরথীর পশ্চিম পারের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ পূর্ব মেদিনীপুর থেকে। সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা থানা এলাকায় এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের মধ্যে চাষী কৈবর্ত (মহিষ্য), জেলিয়া কৈবর্ত, করণ, তন্তুবায়, খন্ডায়িত, পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয় এবং কিছু সংখ্যক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতের মানুষ। ৪) সবশেষ জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে স্বাধীনতার কিছু আগে প্রতিবেশী বাংলাদেশ রাষ্ট্রে প্রধানত যশোহর, খুলনা, বরিশাল ইত্যাদি জেলা থেকে। এঁদের মধ্যে পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই সঙ্গে এসেছেন- নমঃশুদ্র, রাজবংশী, চাষী কৈবর্ত (মহিষ্য), যোগী, কপালী, জেলিয়া, কেবর্ত ইত্যাদি। নিম্ন বর্গের ও মুসলমান এবং স্বল্প সংখ্যক বর্ণহিন্দু জাতের মানুষ। এঁদের আগমনে জনবহুল হয়ে উঠেছে হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, মীনাখাঁ, হাড়োয়া, সন্দেশালি, গোসাবা, বাসন্তি, ক্যানিং, কুলতলি, রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ থানার গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ। সুন্দরবন সভ্যতা রক্ষা করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়বদ্ধতা পালন করছেন এখন এইসব মানুষেরা।

২.২ সুন্দরবনে পুরাকালীন জনপদ

অতি প্রাচীনকাল হতে সুন্দরবনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগীরথী ও পদ্মা-মেঘনার মধ্যবর্তী ভূভাগ যে পলিমাটি সংযোগে যুগ যুগ ধরে গঠিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের প্রায় সর্বত্র যে এককালে সুন্দরবন ছিলো অবস্থা দর্শনে তাহাই প্রমাণিত হয়। মানুষের প্রয়োজনে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকম্প, প্লাবনে বা ঝটিকায় সুন্দরবনের আকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। বহুস্থানে সুন্দরবন সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং মনুষ্য বসতির প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরে নগর ও লোকালয় গড়ে ওঠেছে। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী স্থানে পলিমাটি জমিয়া এখনও চর পড়ছে এবং সুন্দরবন দক্ষিণ সীমায় আরও আয়তন বৃদ্ধি করছে। সুন্দরবনের উত্তরদিকে জঙ্গল কেটে বহু স্থান লোকালয়ে পরিণত করা হয়েছে।

সুন্দরবন যে অতীব প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। পূর্বে যেখানে সুন্দরবন ছিলো এখন সেখানে শহর ও লোকালয়। গঙ্গা-নদীর শাখা-প্রশাখা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে, সেই স্থানের উপরিভাগ কালে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে সুন্দরবনে পরিণত হয়েছে। গঙ্গা হিমালয়ের শীর্ষ দেশ হতে অত্যধিক পরিমাণে গৈরিকমৃত্তিকা বহন করে সাগরে ফেলে দেয়। এই মৃত্তিকা এবং নদী তীরস্থ ভগ্ন বা ক্ষয়িত ভূভাগ পলিমাটি রূপে নদীর মোহনার সন্নিকটে সঞ্চিত হয়ে ক্রমে ক্রমে চরভূমির সৃষ্টি করে। প্রথমে এটা দ্বীপাকৃতি হয়, পরে বৃক্ষাদি জন্মে নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়।

গঙ্গা নদীর সুমিষ্ট জল ও সামুদ্রিক লবণাক্ত জলের সংমিশ্রণে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের জন্ম হয়। সুন্দরবনের বৃক্ষ জন্মাবার এটাই বৈশিষ্ট্য। গঙ্গা নদীর শাখা প্রশাখা সমূহের মোহনা যতই দক্ষিণ দিকে সরছে সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন ততই দক্ষিণগামী হচেছ।

এককালে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের আকৃতি ক্ষুদ্র ছিলো এবং যশোহর-খুলনা ও বাকেরগঞ্জের অধিকাংশ স্থান অতল সমুদ্রের মধ্যে বিলীন ছিলো। সেই সুপ্রাচীনকালের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। মৃত্তিকা খনন করলে এখনও ব-দ্বীপের বহুস্থানে বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া যাবে। তেরখাদা ও কালিয়া থানার বিভিন্ন স্থানে পুকুর খননকালে এখনও অসংখ্য বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া যায়। তাকে লোকে বচের গাছ বলে। মঠবাড়িয়া হাইস্কুলের পুকুর-খননকালে সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া গেছে। ২৪ পরগণায় ও কলকাতায় এবং যশোর খুলনার বিভিন্ন স্থানে পুকুর খননকালে অসংখ্য বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া গেছে এবং সেগুলো সুন্দরী বৃক্ষের বলে প্রমাণিত হয়েছে। দৌলতপুর থানার মধ্যডাঙ্গা ও খুলনা শহরের বানিয়াখামার গ্রামে পুকুর খননকালে বহু-প্রাচীন বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া গেছে।

দিগ্বিজয় প্রকাশে যশোর প্রদেশ কানন সংযুক্ত ছিলো বলে বর্নিত আছে। পানিনির মহাভাষ্য কতগুলো আর্যবর্তের সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে কালবনের উল্লেখ করা হয়েছে। এই কালবনই সম্ভবতঃ সুন্দরবন।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ যুগেও সুন্দরবনের অস্তিত্ব ছিলো। বৈচিণক পবিত্রজনকদের বিভিন্ন বর্ণনায় সুন্দরবনের বিশিষ্ট রূপের উল্লেখ না থাকলেও তা হতে সুন্দরবনের অস্তিত্বের বিষয় জানা যায়।

সুন্দরবন যেন রাজগণের রাজ্যাধীন ছিলো। দিগ্বিজয় প্রকাশে লেখা আছে যে, লক্ষণসেনদের যশোরেশ্বরীর সন্নিকটে এক শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। সেন বংশের রাজত্বকালে সুন্দরবনের কোন কোন অংশে জনবসতি এবং কোন কোন স্থান গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিলো। খৃষ্টীয় চর্তুদশ শতকে বঙ্গে তুর্ক-আফগান শাসন দৃঢ় হলে সুন্দরবন পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তৃত হয়।

ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায় বলেনঃ "পঞ্চদশ শতকে খান জাহান আলী সুন্দনবনের গভীর অরণ্য আবাদ করে ঐ জায়গায় গ্রাম ও নগরের পত্তন করেন। উহাকে বৃহৎ জনপদে পরিণত করে ছিলেন। এই সময় সুন্দরবনে যাতায়াতের পথ সুগম হয়।"[৩১]

সুন্দরবনের নদীনালা ও জঙ্গলে এখনও যেরূপ অবস্থা পাঁচশ বছর পূর্বেরও তদরূপ ছিলো। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভাগীরথীর মধ্যে দিয়া প্রধান তীর্থ ছত্রভোগে উপস্থিত হন।

"এই মত প্রভু জাকুলে কুলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতুহলে।"[৩২]

কবিকংকন ও ছত্রভোগের উল্লেখ করেছেন। তাঁহার প্রশ্নে ভাগীরথীর তীরস্থ সুন্দরবনের অনেক স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। কবিকংকনের কাব্যে সাগর সঙ্গমের উল্লেখ আছে;

"যেখানে সাগর বংশ ব্রহ্ম-শাপে হৈল ধবংস
অঙ্গার আছিল অবশেষ
পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুণ্ঠ চলে
সবে হয়ে চতুর্ভূজ বেশ।।
মুক্তিপদ এই স্থান, ইহাতে করিয়া স্নান
চল ভাই সিংহল নগরে।"[৩৩] কবিকংকন চন্ডি

পর্তুগিজদের সময় পোর্টাগ্রান্ডি চট্টগ্রাম থেকে পিপলি, বালেশ্বর, সপ্তগ্রাম, গুগলি বা পোর্টাগ্রান্ডি চট্টগ্রাম থেকে পিপলী, বালেশ্বর, সপ্তগ্রাম, হুগলী বা পোর্টাপেকিনো প্রভৃতি বন্দরে তারা সমবেত হত। তজ্জন্য সুন্দরবনের

Dhaka University Institutional Repository

নিকটস্থ সমুদ্র পথে তাদের প্রতি নিয়মিত যাতায়াত করতে হত। বাকলা থেকে চন্ডিকান (প্রাচীন যশোর) আসার পথে ফেনসেকো ও এন্ড্রু নামক দুইজন পুরোহিত সুন্দরবনের নদ নদী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। তাঁহারা সুন্দরবনের ভয়সংকুল বনস্থলী ও জলদস্যুর কথা বর্ণনা করেছেন।[৩৪]

তোডরমল্লের জরিপে সুন্দরবনের উল্লেখ নেই। তবে বঙ্গদেশে ১৯টি সরকার তাঁর সময় সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে খলিফাতাবাদ একটি। এই সরকার শাহসুজার সময় দুই পরগণায় বিভক্ত হয়ঃ- (ক) আকলা- গোচারণ-ভূমি এবং - (খ) বুনজের বা বনভূমির ফসল। সুন্দরবনকে তখন মোরাদখানা ও জেরাদখানা বলা হত। এর নামমাত্র রাজস্ব ছিল ৮৪৫৪ টাকা। বাকেরগঞ্জের সুন্দরবন বোজর্গ উমেদপুর পরগণার অধীন ছিল। তখনও অধুনা সুন্দরবন পরগণার সৃষ্টি হয়নি। বাকেরগঞ্জ জেলায় মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের মিষ্টি জলের আধিক্যে খুলনার ন্যায় লবণাক্ত জল অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারায় তা সুন্দরবনও প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে।

'সুন্দরবনের নরখাদক' (Man Eaters of Sunadrbans) পুস্তক প্রণেতা তাহাওয়ার আলী বলেছেন যে, সুমুদ্র গর্ভে পলিমাটি জমতে জমতে প্রশস্ত হয়ে দু' সহস্র বছর পূর্বে সুন্দরবন সৃষ্টি হয়। এই মন্তব্যের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই। এই পুস্তক খানি নানা প্রকার গল্প-গুজবে পূর্ণ, ঐতিহাসিক বিষয় কিছুই নেই। পর্তুগীজদের পর ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ জাতি বাণিজ্যার্থে বঙ্গদেশে আগমন করে। ডি-ব্যারোর মানচিত্রে সুন্দরবনের মধ্যস্থ পাঁচটি নগরীর নির্দেশ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তিনটি বাকেরগঞ্জ এবং দু'টি খুলনা জেলায় বলে নিখিল বাবু অনুমান করেছিলেন।

আড়পাঙ্গাশিয়া ও মালঞ্চের মধ্যবর্তী জঙ্গলে হরিখালী ও পূর্ববর্ণিত সিন্দুকখালীতে ইষ্টক নির্মিত বাড়ির ভগ্নাবশেষ আছে। বেয়ালাকয়লা দ্বীপের পার্শ্বে বিবির মাদিয়ার পুরান রাস্তা আছে। তাকে গোলাপদী খালীর আট বলে। তা প্রায় ১ মাইল লম্বা। ধুমঘাট, জাহাজঘাটা, বসন্তপুর, মহতপুর, নূরনগর প্রভৃতি স্থান জুড়ে সুন্দরবনের যে অংশে শহর গড়ে ওঠেছিলো। তার আশে পাশে আরও বহুদূর বেষ্টন করে জঙ্গলের মধ্যে লোকালয় স্থাপিত হয়েছিলো। পরভাজ খাঁ নামক জনৈক পাঠান প্রতাপাদিত্যের বহু পূর্বে কালিগঞ্জর দক্ষিণে জঙ্গল আবাদ করে বসতি স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, পরভাজ খাঁ নামক সেনাধ্যক্ষ যমুনা নদী তীরে এই স্থানে এসে ঘাঁটি নির্মাণ করেন। তিনি এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। জঙ্গলময় স্থানে এখনও মসজিদটি কোন প্রকারে টিকে আছে। তাঁর নামানুসারে গ্রামের নাম হয় পরভাজপুর। এর অদুরে মুকুন্দপুরের গড়।

Dhaka University Institutional Repository

আশাশুনি থানার অন্তর্গত প্রতাপনগর ও শ্যামনগরের মধ্যে গড়কোমলপুরে প্রতাপাদিত্যের গড় ও সেনানিবাস ছিলো। প্রতাপাদিত্যের অন্যতম। সেনাপতি খাজা কামালের নামানুসারে এই নগরীর নাম হয় কামালপুর, পরে ওই নাম কোমলপুর এবং বিকৃত হয়ে কোমলপুরে পরিনত হয়েছে। আশাশুনি বাজারের পশ্চিম পাশে গুতিয়াখালী নদী। এর পশ্চিম দিকে সাঁইহাটি গ্রাম। এই স্থানে এক সময় গভীর জঙ্গল ছিলো। স্থানীয় প্রবীন লোকদের মুখে জানা যায় যে, প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে গভীর জঙ্গল আবাদ হয়। সেখানে কয়েকটি পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সাঁইহাটীর পাশে উজিরপুর গ্রাম। এখানে একটি বৃহৎকায় পাকা ইমারতের প্রাচীন ভগ্নাবশেষ ছিলো। একে সাধারণে, উজিরের বাড়ী বলে! দশালীয়া ও প্রতাপনগরে এখনও বিরাট গড় আছে এবং এর পাশে খোলপেটুয়া নদীর তীরে একটি মিষ্টি জলের পুকুর আছে। সুন্দরবনের কোথাও পানীয় জল পাওয়া যায় না। সবই লবনাক্ত। সেই জন্য বিশ মাইল দূরে অবস্থিত থাকলেও বহুলোক এখান থেকে নৌকাযোগে পানীয় সংগ্রহ করতো। এই ধরনের পুকুর থেকে এককালে সুন্দরবনের একপ্রকার স্থানে কিছু লোক বসতি ছিলো বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। প্রতাপনগরের উত্তরে বিছটগ্রাম। এখানে নৌ-বাহিনীর অধীনে সুন্দরবনের মধ্যে একটি ডক প্রস্তত হয়েছিলো। এখানে বানিয়াপুকুর নামে একটি দিঘি ও বিরাটকায় গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান। লঞ্চযোগে দক্ষিণ খুলনা ভ্রমণ করলে এই সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান ও কীর্তিরাজি দেখা যায়।

হরিণঘাটার মোহনা থেকে চাঁদেরআড়া নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এর পাশে এখনও পুকুর ও কলাগাছ আছে। সেখানে রাস্তার চিহ্ন এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে এই চাঁদের আড়ায় বিখ্যাত চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গাগুলোর পোতাশ্রয় ছিলো। হরিণঘাটার পশ্চিম দিকে বাঘেরকোণা (Tiger Point)- এর সন্নিকটে ইটের স্তুপ আছে। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে এখানে একটি পোতাশ্রয় ও বানিজ্য কেন্দ্র ছিলো। পণ্ডরের নিকট নন্দবালা নামক খালের উত্তর তীরে জঙ্গলের মধ্যে বকুল বৃক্ষ বেষ্টিত একটি দীঘি মনুষ্য বসতির কথা প্রমানিত হয়। শেলা নদীর পাশে তান্নুলবুনিয়ায় একটি জলাশয় ও এর উত্তর পাড়ে নারিকেল ও খেজুর বৃক্ষ জঙ্গলের মধ্যে বিরাজ করছে। খড়মা নদী থেকে সোনাখালী খাল দক্ষিণে শেলা নদীতে পড়েছে। এর পাশে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ সুন্দরবনের জানোয়ারসমূহের আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে।

কপোতাক্ষীর তীরে আমাদী গ্রামে পীর খানজাহান আলী (রহঃ), শিষ্যদ্বয় বুড়ো খাঁ ও ফতে খাঁ এতদঞ্চলে আবাদ করেন। ওই গ্রামে তাঁদের সমাধি এখনোও বিদ্যমান। সম্ভবতঃ ফতে খাঁর নামীয় ফতেকাটি গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিবসা নদীর তীরে পাটকেলপোতা মৌজায় অনেকগুলো ইটের স্তুপ পাওয়া গেছে। "পাটকেলপোতা" শব্দ এর পরিচয় দেয়। এখানেও পুরাকালে সুন্দরবনের মধ্যে জন বসতি গড়ে ওঠেছিলো। এখানে শিবসা নদীর ভাঙ্গনকুলে মৃত্তিকার নিম্নে বহু ইট পাওয়া যায় এবং অনেক সময় এর মধ্যে গৃহস্থের ব্যবহার্য প্রাচীন কালীন জিনিষপত্র পাওয়া গেছে।

রায়মঙ্গল চেকপোষ্টের পশ্চিমে প্রায় বিশ মাইল দুরে জঙ্গল মধ্যে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে চতুদিকে আট নয় মাইল জুড়ে মধ্যে মধ্যে বসতবাড়ির ভগ্নাবশেষকে ভাটির প্রধান দক্ষিণ রায় ও রাজা মুকুটরায়ের বাড়ি বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। লোকে বলে এখানে দড়ার ঘাট পার হয়ে গাজী যুদ্ধযাত্রা করেছিলো।

সরল ও লস্কর গ্রামের বিশালকায় দিঘিসমূহ এ অঞ্চলে সে কালের মনুষ্য বসতির পরিচয় বহন করে। এ সমস্ত প্রমাণ দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাকেরগঞ্জ ও খুলনার দক্ষিণে সর্বত্র জনবসতি ছিলো এবং পরে মগদের অত্যাচারে বা প্রাকৃতিক দূর্ঘটনার কবলে পড়ে লোকে স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। পুনরায় এই সমস্ত স্থান জঙ্গলে পরিণত হয়। বহু পরে আবার জঙ্গল কেটে এ সব স্থানে দ্বিতীয়বার মনুষ্যবসতি গড়ে ওঠেছিলো। যারা কাটি বা জঙ্গল কেটে সর্বপ্রথম গ্রামের পত্তন করেছিলো তাদেরকে 'কাটিকাটা' বলা হয়। তারা গ্রামের আদি বাসিন্দা বলে গৌরব অনুভব করে। এদেশে 'কাটিকাটা' বংশকে গ্রামের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

মঙ্গলা পোর্টের পশ্চিমে করমজলীর জঙ্গলে রাস্তা,পুকুর ও বাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সেখানে গাবগাছ ও বকুলগাছ বহুকাল ধরিয়া বেঁচে আছে। এখানে সুন্দরবনের দুষ্প্রাপ্য মাগুর ও কই মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। করমজলীয় উত্তরে বানীশান্তা ও লাউডোবের আবাদ। এখানেও জঙ্গল কেটে চাষীরা ধানি ফসল ফলাচ্ছে। কানীবাড়ীর খালের পাশে এক প্রকান্ড ইটের স্তুপ দেখা গিয়েছিলো। শরণখোলা ফরেস্ট অফিসের পশ্চিম দিকে ভোলা নদীর ওপর প্রাচীর বেষ্টিত একটি বাড়ি ছিলো, এর ভগ্ন প্রাচীর আজও বিদ্যমান। চাঁদপাই ফরেস্ট অফিসের দক্ষিণ পূর্ব সোনামুখী খালের পাশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি ইটের পাঁজা পাওয়া গিয়েছিলো।

আড়ো শিবসা থেকে গ্যান্ডারখালী নদী উত্তর দিকে গেছে। এর তীরে প্রকান্ড দিঘি প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। এই দীঘি গ্যান্ডার-খালি দিঘি নামে সু-পরিচিত। দিঘির পাশ দিয়ে পুরাতন রাস্তার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এ স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাঘ্রের আভড্া খুব বেশি। সুউচ্চ স্থানে জোয়ারের জল না আসার জন্য এখানে সর্বদা ব্যাঘের আনাগোনায় ভরপুর থাকে। এখানে আরও একটি দিঘি আছে, একে লোকে বুড়ের পুকুর বলে। এখানে কয়েকটি বকুল ও গাবগাছ আছে। মুরলীর খালের পাশে জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলো পাকা বাড়ির ভগ্নাবশেষ, গাব ও জিওল গাছ আছে।

চাঁদপাই জঙ্গলের দক্ষিণে চাঁদেশ্বর খালের পাশে পুরানো অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে দু'টি নারিকেল ও একটি তালগাছ আছে। একটি দিঘি ও উহার একটি পাকা ঘাটও দৃষ্ট হয়। এককালে এখানে জনবসতি ছিলো। তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। সুন্দরবনের পশ্চিম দিকে নেটোর দোয়ানে ও মহিষাদল নদী। এ নদী থেকে একটু দক্ষিণ দিকে যেয়ে এ জায়গা থেকে বসতবাটীর সর্বপ্রকার চিহ্ন দেখা যায়। একটি বাড়ির ভগ্নস্তুপ এবং কবরস্থানের চিহ্ন আছে। কবরস্থানটি পাকা ইট দিয়ে এককালে তৈরি হয়েছিলো। ছাচনাংলা খালের পশ্চিম দিকে পাশখালী, ভারানী এবং মঠের খাল। মঠের খালের পাশে একটি ইটের পাঁজা ছিলো। এখানে বট ও গাব গাছ পরিলক্ষিত হয়।

পর্তুগিজেরা এদেশ থেকে চিরবিদায় নিয়েছিলো কিন্তু মগেরা অনেক বনাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এদেশে থেকে যায়। তারা পটুয়াখালী মহকুমার গুলিশাখালী থানার অধীন চাপালী, নিশানবাড়ি, মোধুবী, খাপরাডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করে। মগেরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কয়েক সহস্র মগ, সবাই বাংলায় কথা বলে। কুকরী মুকরী, নলুয়া, কলমীরচর ও খেপুপাড়ায়ও মগবসতি আছে। বরিশাল-খুলনার আদিম আধিবাসী, দক্ষিণ বাকেরগঞ্জের চন্ড ভন্ড জাতি, বরিশাল-খুলনার আদিম অধিবাসী, দক্ষিণ বাকেরগঞ্জের চন্ডভন্ড জাতি, যশোর-খুলনার পৌন্ড্রগণ সর্বপ্রথম সুন্দরবনে বসতি স্থাপন করে। খানজাহান ও প্রতাপাদিত্যের পিতার ন্যায় দুনুজমর্দনদেবও চন্দ্রদ্বীপে বনাঞ্চলে এক রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সময় এখানে অসংখ্য নতুন বসতি গড়ে ওঠেছিলো। তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম তীরে কচুয়ায় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের রাজধানী ছিলো। মগের অত্যাচারে বা নদী ভাঙ্গনে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

বরিশাল থেকে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সুজাবাদ গ্রামে একটি পুরান দুর্গের শেষ চিহ্ন বিদ্যমান। সম্রাট শাহ্জাহানের পুত্র শাহ্ সুজা যখন বাংলার সুবেদার ছিলেন তখন সুন্দরবনাঞ্চলে মগদিগের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য এই দূর্গটি নির্মাণ করেছিলেন। আজও সুজাবাদ গ্রাম মুঘল যুবরাজ শাহসুজার নাম বহন করে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

শায়েস্তা খাঁনের ভ্রাতা বোজর্গউমেদ খাঁ মগ অত্যাচার দূরীকরণে এক বলিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তার নামানুসারে বাকেরগঞ্জের স্থানে স্থানে এখনও প্রাচীন কালীন বহু জলাশয় ও অন্যান্য নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

শিবসা নদীর পূর্বতীর যেখান থেকে শেখের খাল পূর্ব দিকে গিয়েছে এর সঙ্গমস্থলের জঙ্গলের নাম শেখেরটেক। এ সম্পর্কে এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল বলেন, "সুন্দরবন ভ্রমণকালে একসময় উত্তর দিক থেকে এই স্থানের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করতে করতে আমরা একদল ভ্রমণকারী শেখেরটেকে উপস্থিত হই। সুন্দরবনের কেন্দ্রস্থলে এ স্থান অবস্থিত। কাঠুরিয়া ও ভ্রমণকারীদের নিকট স্থানটি সু-পরিচিত। আমরা দশ জন ভ্রমণকারী, কয়েকটি বন্দুক ও রাইফেলসহ জঙ্গলে প্রবেশ করি। নদী তীর হইতে অনুন্য ১০০ গজের মধ্যেই কথিত শেখেদের বাড়ী। নদী তীরেই কয়েকটি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখতে পাইলাম। কালের কঠোর আঘাত ও শিবসার ভয়াবহ তান্ডবে তীরভূমি ভেঙ্গে অট্টালিকাগুলি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। এখনও লবণাক্ত জলে ক্ষয়িত ইটের চিহ্ন দেখলে ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই প্রকার কয়েকখানা ইট আমরা সঙ্গে এনেছিলাম। শেখের বাড়ীতে প্রবেশ করে অনেকগুলি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এবং বাড়ীগুলির মধ্যস্থলে একটি জলাশয় দর্শন করি। অট্টালিকার মধ্যে কয়েকটি দ্বিতল বলে অণুমিত হয়। জলাশয়ের চর্তুদিক প্রাচীর বেষ্টিত। এর ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। এ স্থানে সুন্দরবনের দুষ্প্রাপ্য এবং লোকালয়ের পরিচিত জিওল, সড়া, গাব গিলেলতা, ক্ষুদে জাম ও বটগাছ আছে। একটি প্রকান্ড জিওল গাছ এর বেড় ৯৪´´ ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় আট ফুট। এই স্থানে কবে কারা বাস করত তার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সাধারণের নিকট ইহা শেখের বাড়ী বলে সুপরিচিত। নলিয়ান ফরেষ্ট অফিস হতে শেখেরটেকের দূরত্ব দক্ষিণ দিকে ২০ মাইল হবে। শেখেরটেকের অবস্থান সম্পর্কে খুলনা গেজেটীয়ার প্রণেতা ওমালী সাহেব যে বর্ণনা দিয়েছেন, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র তা অনুসরণ করেছেন। এ বর্ণনার সাথে আমরা ঐক্যমত স্থাপন করতে পারিনা। শেখের বাড়ী কথিত স্থানটি সম্পর্কে সতীশ বাবু লিখেছেনঃ "বাস্তবিকই এই স্থানে উপরে বহুদূর ধরিয়া নানা বসতি চিহ্ন আছে। তন্মধ্যে একটি বাড়ী বেশ জাঁক জমকশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। উহাকে কাঠুরিয়াগণ "কামার বাড়ী" বলে। কারণ কোন কালে নাকি সেখানে কামার দিগের লোহাপিটান একটি "নোহাই" পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রবাদ মাত্র। দ্বিতল একটি বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিলে তাহা কোন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ধনীর বাড়ী বলে মনে হয়।" আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও এখানে "কামার বাড়ী" বলিয়া কথিত বাড়ী পাই নাই এবং ঐরূপ কোন প্রবাদের বিষয়ও জানতে পারি নাই। কাঠুরিয়া, শিকারী ও সুন্দরবনের নিকটবর্তী সকলের কাছেই উহা শেখের বাড়ী বলিয়া সু-পুরচিত।"[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

সতীশবাবু শেখেরট্যাকের অবস্থান সম্পর্কে বলেছেনঃ "মার্জাল* নদী হইতে একটি খাল পূর্বাভিমুখে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে, উহার নাম কালীর খাল। শেখের খাল ও কালীর খালের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি বিশিষ্ট নিবিড় জঙ্গলকে শেখেরট্যাক বলে।"[৩৬] এ সম্পর্কে আব্দুল জলীল বলেন, "কিন্তু উহা ঠিক নহে। শেখের খাল এবং কালীর খাল শিবসা নদী হইতে পূর্বদিকে গেছে। মার্জাল নদীর কোন নাম গন্ধ এখানে নাই। শেখের খালের সংলগ্ন উত্তর- দিকে শিবসা নদীর তীরে শেখেরট্যাট অবস্থিত।"[৩৭]

তিনি আরো বলেন, "আমরা ভ্রমণ কালে বরাবর শেখের খালের মধ্যদিয়া দুই তীরবর্তীর গভীর জঙ্গল অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে প্রায় দেড় মাইল পৌঁছিবার পর খালের দক্ষিণ তীরে একটি প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। এখানে কয়েকটি গাবগাছ আছেঃ তথায় নৌকা রাখিয়া আমরা দক্ষিণ দিকে পদব্রজে গাছের ঘন গুড়ি, গুলো ও হদোবনের মধ্য দিয়া কর্দমাক্ত পথ ধরিয়া প্রায় এক মাইল পরে একটি নগরের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। সেখানে এক বিরাটকায় দীঘির চারিপার্শ্বে দূর্গের ভগ্নাবশেষ, দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে একটি মন্দির ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। ভগ্ন অট্টালিকার স্তুপ ও মন্দিরের মধ্যে প্রায়ই বাঘ্রদল আসিয়া আশ্রয় লয়। ভয়সঙ্কুল গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলাম। শেখের বাড়ির ন্যায় এখানে প্রচুর বট ও গাবগাছ ইত্যাদি আছে। জলাশয় প্রচুর মৎস্যে পূর্ণ। জলাশয়ের চারিদিকে শতাধিক পাকা ইমারতের ভগ্নাবশেষ। মন্দিরটি কোন সময় নির্মিত সঠিকভাবে কেহ বলিতে পারে নাই। মন্দিরের ইটের ম্যাপ ৬" X ৩" X ২" এবং ছোট সাইজের টালির মত ইটও ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের দরজা খোলা।" অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র এই স্থানকে রাজা প্রতাপাদিত্যের শিবসা দূর্গ অথবা মোগল আমলে নির্মিত কোন দূর্গ বলে অনুমান করেছিলেন। মন্দিরের অবস্থানের জন্য এই স্থান সাধারণের নিকট কালীবাড়ি বলিয়া সু-পরিচিত এবং এর দক্ষিণ দিকের খাল, কালীর খাল নামে পরিচিত। এ স্থানকে অবশ্য কেউ কেউ কামার বাড়িও বলে।

উপরোক্ত কালীবাড়ির প্রায় এক মাইল দক্ষিণ পূর্বে এবং কালীর খালের উত্তর পারে অনেকগুলো বাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। সেখানেও অনেক ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। এই অঞ্চলটি গড়ে ১০ বর্গমাইল হবে। এককালে এখানে বহুলোকের বসবাস ও গমনাগমন ছিলো তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। সম্ভবতঃ মগ-পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে প্রজাগণকে রক্ষা করা জন্য মোঘল শাসকেরা এই খানে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেন এবং তথায় সুন্দর লোকালয় গড়ে তুলেছিলেন। মন্দিরটি হিন্দুরাজ কর্মচারীদের জন্য নির্মিত হয়েছিলো।

*মর্জাল শব্দটি এসেছে মারজান আরবি থেকে। মারজান বাহার শব্দ অর্থ প্রবল সাগর। অপভ্রংশের কারণে মানুষ মারজানকে মর্জাল বলেছে আর বাহার শব্দটি গ্রহন করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ওমালী বলিয়াছেন যে, "মোঘল সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে পর্তুগীজদের প্রণীত মানচিত্রে বঙ্গোপসাগরের তীরে পাঁচটি শহরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের নাম যথাক্রমে কুইপিটাভীজ, নলদী, ডাপারা, প্যাকাকুলী এবং টীপারিয়া। শেখেরট্যাক, কালীবাড়ী প্রভৃতি স্থান মিলিয়া এই পাঁচটি শহর একটি হইতে পারে।" গভীর অরণ্যানীর মধ্যে এবং ব্যাঘ্র সঙ্কুল স্থানে এই ধরেনের প্রাচীনকীর্তি অদ্যাটি দর্শকদের অন্তরে অপরূপ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

পর্তুগিজদের উপরোক্ত মানচিত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে সুন্দরবন উর্বরদেশ এবং তাতে পাঁচটি নগরী প্রদর্শিত হয়েছে। ডি ব্যারোজ প্রণীত এশিয়ার ইতিবৃত্তে তা প্রমাণিত হয়। পেচাকুলী ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে একটি পরগণা ছিল। কুইপিটাভীজ খুব সম্ভব খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট)। খলিফাত পর্তুগীজদের বিকৃত ভাষায় কুইপীট এবং আবাদ থেকে আভাজ হয়েছে। ভ্যান্ডেন ব্রুক ও মিঃ ওমালী এই মতে প্রতিষ্ঠাতা। ডাপারা ও নলদী সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। টিপারীয়াকে ত্রিপুরার বিকৃত নাম বলে সতীশ বাবু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা শুধু অনুমান মাত্র। মুঘল পর্তূগিজ আমলে বঙ্গোপসাগর থেকে ত্রিপুরা বহুদূরে অবস্থিত ছিল এবং সুন্দরবনের সাতে এই স্থানের কোন সম্পর্ক ছিলো না।

সুন্দরবন ঘনবসতিপূর্ণ শহর ছিলো, না মধ্যে মধ্যে বসতি ছিলো অথবা বর্তমানের ন্যায় জঙ্গলহীন ছিলো এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ব্লকম্যান বলেন যে সুন্দরবনে কোন এক সময়ে শহর, পথঘাট এবং বাড়িঘর গড়ে ওঠার চেষ্টা চলেছিলো মাত্র। ক্যাপ্টেন মরিসন বলেন যে সুন্দরবনে ঘনবসতি ছিলো এবং চাষাবাদ হত। ব্লকম্যান এ মতের বিরোধী। তিনি বলেন যে পর্তুগীজ ও ডাচ মানচিত্রে সুন্দরবনে যে পাঁচটি শহরের উল্লেখ আছে তা কিছুই প্রমাণ করে না। ওমালী বলেন যে, তোডরমল্লের জরিপে জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দিতে এখানকার ন্যায় জঙ্গল ছিলো। বিভারিজ বলেন সুন্দরবনের জঙ্গল এখন যে অবস্থায় আছে তখনও তদরূপ ছিলো। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে বাঙ্গালী জাতি অতীতকে অনেক বড় করে দেখে এবং তারা বলে যে, সুন্দরবনে বড় বড় শহর ছিলো। আমাদের মন্তব্য মন্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অধিক লেখা নিস্প্রয়োজন মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ সুন্দরবনে মানব বসতি

সুন্দরবনে মানব বসতি ছিল কিনা সে বিষয়ে দু'টি অভিমত আছে। প্রথম অভিমত অনুসারে সুন্দরবনে পূর্বে বসতি ছিলো, সুন্দর নগরীসমূহ ছিলো কিন্তু নানাবিধ কারণে তা নষ্ট হয়ে গেছে। ইতিহাসবিদ সতীশ চন্দ্র মিত্র এ অভিমতের সমর্থক। দ্বিতীয় অভিমতঃ অনুসারে সুন্দরবন কখনো সুন্দর বাসভূমি ছিলো না। কখনো কখনো দুঃসাহসিক মানুষেরা এর আবাদ করতে বা বসতি পত্তন করতে চেষ্টা করলেও কখনো এর ভাল অবস্থা ছিলো না। বিভারিজ ব্লকম্যান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পন্ডিতগণ এ মতের অনুসারী ছিলেন।[৩৮]

বর্তমান জোয়ার বিধৌত সুন্দরবন পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দিতে স্থিতি লাভ করে, যদিও সুন্দরবনের প্রাচীন অংশ ছয় হাজার বছর ধরে তৈরি হয়েছে।[৩৯] সুন্দরবন মানুষের বসবাসের যথেষ্ট অনুকুল না হলেও প্রাচীনকালে মানুষ নানা কারণে সুন্দরবন অঞ্চলে বসতি গড়েছে। এ অঞ্চলে মানব বসতির বিস্তার শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দিতে সম্রাট অশোক এর আমলে। প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা ছিলো পোদ ও চন্ডাল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। একাদশ শতকের প্রথম দিকে মহামারী এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তনজনিত কারণে এ বসতি স্থাপন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হলেও তা একেবারে থেমে থাকেনি। মোঘল শাসনামলে ৫টি অঞ্চলে গভীর বন কেটে আবাদী জমির ক্ষেত্র এবং বসতি পত্তনের বিবরণ আছে ঐতিহাসিক রিচার্ড ইটন এর গ্রন্থে।[৪০] ষোড়শ শতকের দিকে প্রতাপাদিত্য যশোরে সুন্দরবন অঞ্চলেই নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৪১] ১৭৫৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব এর কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ১৭৬৪ সালে সর্বপ্রথম সুন্দরবনের সীমানা চিহ্নিত করা হয়। ১৭৭০ সালে ব্রিটিশ শাসকের প্রতিনিধি ক্লড রাসেলের সময় থেকে সরকারিভাবে বন আবাদ করে এর পাশে বসবাস শুরু করা হলেও এর বহু শতক আগে থেকে আদিবাসী নানা সম্প্রদায়ের লোকজন সুন্দরবন সংলগ্ন প্রান্তসীমায় বসবাস করে আসছে। এদের অনেকেই হিন্দু তপশীলি সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত। জানা যায়, আজ থেকে ২০০ বছর আগে আরাকান উপকুল থেকে হাজার হাজার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালিয়ে সুন্দরবনে এসে আশ্রয় নেয়। সুন্দরবন কেটে বসতি গড়ে তুলতে বিহার, রাঁচি, বীরভূম, বাঁকুড়া ও উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষদেরও আনা হয়েছিলো।[৪২] যাদের কেউ কেউ এখনো কয়রা, শ্যামনগর প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে। এছাড়া ওরাঁও এবং সাঁওতালরাও এসেছিলো।[৪৩] তারা দক্ষিণ রায় ও বনবিবির পূজার প্রচলন করে। আবার সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়াতে থাকে মূলত চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দি থেকে।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ সুন্দরবনের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী মুন্ডারাই

মুন্ডারাই সুন্দরবনের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। বাদাবনের জঙ্গল সাফ করে এক সময় তাদের পূর্ব পুরুষেরা বসবাস ও আবাদ করা শুরু করে ওই অঞ্চলে। মূলত ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পর সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার জমিদারেরা সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে চাষবাস ও জনপদ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে স্থানীয় জমিদারেরা সম্পত্তির বন্দোবস্ত নিয়ে কৃষি কাজ ও জঙ্গল আবাদের জন্য ভারতের রাঁচী অঞ্চল থেকে নিচু শ্রেণির কিছু লোকদের নিয়ে আসেন। তারাই তখন দুর্গম ও বিপদ সংকুল জঙ্গলে এসে শুরু করেন চাষাবাদ। সুন্দরবনের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল এদেরকে 'বুনো' বলে তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন। হয়ত বনে বাস করত বলে তাদের তখন এ নামে পরিচিত করানো হতো।

রাঁচী থেকে কৃষি শ্রমিক হিসেবে আসা সেসব লোক যে যতটুকু জমি তখন বন থেকে উদ্ধার করে চাষাবাদ করতে পারত, জমিদাররা ততটুকু জমি তাদেরকেই দিয়ে দিতেন। আজও সেসব জমির দখল অনেক মুন্ডাদের অধীনে রয়েছে। এজন্য তাদের কোনো দলিল পত্র নেই। তবে রেকর্ডে আছে। এখনও মুন্ডারা তাদের সেসব জমি জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করতে পারে না। নগেন মুন্ডা বললেন, প্রায় ছ'পুরুষ ধরে তারা ওখানে আছেন। মুন্ডাদের সম্বন্ধে প্রবাদ ছিলো যে, ওরা কখনো মিথ্যা কলা বলতে জানে না। এ প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি জানালেন, 'এখন আর তো মেনে পারা যাচ্ছে না। মিথ্যা বলতাম না বলেই হয়ত আমরা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছি। দু'একটা না বলে কি পারা যায়? এই যেমন ধরুন, জমি বেচাকেনার কথা। মুন্ডা নাম দেখলে সে জমি বিক্রি করতে গেলে তার কোনো দলিল হবে না। তাই অনেকেই এখন জমি বেচতে গেলে নিজের নামের সাথে পদবী মুন্ডা না বলে হয়ত সরদার বলছে।

তবে মুন্ডাদের মধ্যেও নেতা, উপনেতা, সর্দার আছে। ওরা তাকে মানে। যে কোনো গোলযোগ বিপত্তিতে তারা নিজেরাই সালিশ বসায়, মীমাংসা করে। কোনো দিন কোর্ট-কাছারিতে যায় না। স্থানীয় প্রধানকে বলা হয় মুন্ডারী সরদার।

মুন্ডাদের চেহারার সাথে সাঁওতালদের বেশ মিল আছে। গায়ের রঙ সাধারণত কালো, কর্মঠ দেহ। নাক ও ঠোঁটের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। মাথার চুল হয়ত এক সময় কোঁকড়া ছিলো, এখন বদলে যাচ্ছে। অলংগ মুন্ডা

Dhaka University Institutional Repository

জানালেন, "পূর্বপুরুষরা উড়িষ্যার রাঁচি থেকে এসেছিলেন। তাই তাদের যে চেহারা ছিলো, বাদাবনের লবণ মাটির স্পর্শে ও সময়ের বিবর্তনে এখন তার অনেকটাই বদলে গেছে। এখন শ্যামলা বরণ মেয়েও আমাদের মধ্যে দেখা যায়। বিয়ের জন্য ওদের কদর বেশি।" তবে মুন্ডারা এখনো তাদের স্বগোত্রের বাইরে কাউকে বিয়ে করে না। এজন্য এখনো কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় তারা বয়ে চলেছে। এখন ওরা বাংলা শিখেছে। তারপরও ওদের নিজস্ব ভাষাকে ওরা ছাড়েনি। ওদের ভাষাকে বলে মুন্ডা ভাষা। তবে অলংগ, নডান, জয়দেব প্রমুখ মুন্ডারা শুনেছে, তাদের পূর্ব পুরুষদের ভাষা ছিলো নাগরী। পার্সির মিশেল।[৪৫]

পূর্ব পুরুষদের পোষাক ছিল ভিন্ন। পুরুষরা সাধারণত এক টুকরো কাপড় নেংটি কর পরিধান করতো। মেয়েরাও ছিলো স্বল্প বসনা। ছেরে-মেয়ে সবাইকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। তাই পোশাকের বাহুল্য ছিলো কম। কিন্তু এখন বদলে গেছে। বাঙালিদের মতো ওরাও এখন লুঙ্গি, গেঞ্জি, শার্ট, শাড়ি পরিধান করছে। তবে তাদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা আছে। তাদের রয়েছে মুন্ডারী কৃষ্টি ও ঐতিহ্য, ধর্ম। তারা মূলত কৃষি কাজ করে, নৌকা চালায়, বনে যায়। পুরুষদের মতো নারীরাও সমান পরিশ্রমী। তারাও মাঠে কাজ করে, চাষ করে, মাছ ধরে।

ওদের ধর্ম কী? সুস্পষ্টভাবে বোঝা মুশকিল। তবে ওরা সৃষ্টিকর্তা ও অনেক রকম দেবদেবীকে বিশ্বাস করে। এতে মনে হয়, তারা হিন্দু ধর্মের কিছুটা ধারণ করে। প্রধানত তারা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। তবে ধর্ম নিয়ে ওদের অত আগ্রহ বা কড়াকড়ি নেই। তাদের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ পূজা হল 'বুড়াবুড়ির পূজা', এরপর কালি বা শ্যামা পূজা। দেওয়ালি বা দীপাবলী উৎসবও করে তারা। যেহেতু মুন্ডারা কৃষিজীবী তাই তাদের অর্থনীতি ও সচ্ছলতাও ধান নির্ভর। অগ্রহায়ণ মাসে যখন ধান কাটা হয়ে যায় তখন তারা বুড়াবুড়ির পূজা দেয়। সেটিও বেশ বিচিত্র। প্রায় প্রতি বাড়িতেই এ পূজা হয়। শুধু ছেলেরা অর্থাৎ পুরুষেরা এ পূজা করে, নারীরা করে সহযোগিতা। বুড়াবুড়ি মানে ওরা পিতা-মাতাকে। পিতা-মাতা মারা গেলে ওরা সেই মৃত পিতামাতার আত্মার শান্তি কামনা করে তাদের পূজা করে। কখনো জীবিত থাকতে তা করে না। তারা ঘরের মধ্যে একটা জায়গায় মৃত মা-বাবার নামে আসন সাজাই। সেই নির্দিষ্ট জায়গায় একটা মুরগি কেটে তারা রক্ত দিয়ে নানা রকম চিহ্ন দেয় মাটিতে। মদ, মুরগি ও অন্যান্য খাবার সাজিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে সেসব খাবার দিয়েই বছরে একবার তাদের খাওয়ানো ও তুষ্ট করার চেষ্টা করে এবং তাদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। তবে অন্যান্য খাবার যেমন তেমন, মদ অবশ্যই থাকবে। কেননা মদ মুন্ডাদের এক নিয়মিত ও অবশ্য পানীয়। প্রত্যেক বাড়ির প্রায় সবাই মদ খায়। প্রত্যেক বাড়িতেই মদ তৈরী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ওদের মদ তৈরির কৌশলটাও আলাদা। প্রতি পাড়াতেই ছোটখাটো জঙ্গল থাকে। জঙ্গলে থাকে বুঁজ আর কুঁচ গাছ। বুঁজ মানে বৈঁচি ফলে গাছ। আর কুঁচ মানে কালো মুখের লাল ডিম্বাকার ছোট যেসব দানা দিয়ে আগে সোনা রূপা ওজন করা হত সেসব দানার গাছ। বুঁজ আর কুঁচ গাছই তাদের মদ তৈরির প্রধান উপকরণ। এর সাথে থাকে চাউলের গুঁড়া ও পানি। অলংগ মুন্ডা বেশ রসিয়ে রসিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ভাব দেখিয়ে বললো সেই মদ তৈরির কথা। প্রথমে এক কেজি মতো পরিমাণ চাল দিয়ে ভাত রান্না করে তা কলাপাতায় ঢালা হয়। তবে এর আগে মদ তৈরির জন্য বড়ি বানিয়ে শুকিয়ে রাখা হয়। কুঁচের পাতা বেশ মিষ্টি আর বুঁজের পাতা তিতা। এ গাছের ছাল বাকল শিকড়ও তেমনি স্বাদের। এগুলো কেটে টুকরো টুকরো করে অল্প পানিতে এক রাত তারা ভিজিয়ে রাখে। সেই পানি অথবা এ দু'টো গাছের রস নিংড়ে চাউলের গুঁড়ার সাথে মেশায়। সাথে অল্প পানি মিশিয়ে কাই করে। পরে ছোট ছোট নাড়ুর মতো বড়ি করে রোদে শুকিয়ে রেখে দেয়। এই বড়ির কয়েকটা ভেঙে গুড়ো করে ভাতের সাথে মিশিয়ে দেয়। এরপর সেই ভাত হাঁড়িতে পচিয়ে তৈরি করা হয় মদ। মদকে ওরা বলে কাজিয়া।

কার্তিকে অমাবস্যায় হয় শ্যামা পূজা। সন্ধ্যে বেলায় সেদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোক সজ্জা করা হয়। আর মদ খেয়ে গান গেয়ে মুন্ডারা সে রাতে মেতে ওঠে আনন্দে। প্রত্যেক বাড়ির সকলে সেদিন মদ খায়। প্রতিটি পাড়ায় তৈরি করা হয় একটি গায়েন দল। তারা পাড়ার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত প্রতিটি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে গান করে- 'আনা দিনে ভুসরি/ঘারে ঘারে ঘোরাত্রিহিস।' এ সম্পর্কে মৃত্যুঞ্জয় রায় বলেন, ''তরুলতা মুন্ডা বলল, যারা গায় তারা পুরো গানটা গাইতে পারেন। আমরা তো গাই না। ওদের পিছে পিছে থাকি, ঘুরি। তারপরও সে গানটার দু'লাইন আমাদের গেয়ে শোনাল, ওদের ভাষায়। 'অর্থ কী গানটার?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে। 'সব জানি না, তবে ওটা মশা তাড়ানোর গান। জন্ম থেকেই ও গানটা শুনে আসছি। ' বলল তরুলতা। সাথে বাজে মাদল বা দুঘাং।''[৪৬]

তিনি আরো বলেন, ''ওরা বেশ সহজ সরল। সহজে মিসতে পারে। আপ্যায়নের ইচ্ছেও ব্যক্ত করল। কিন্তু ওই মদ! জানতে ইচ্ছে হল, মদ ছাড়া আর কী খায় তারা? নানা রকম অখ্যাদ্য-কুখাদ্য খায় ওরা। তবে এগুলোই ওদের কাছে সুখাদ্য। ভাত মাছ ছাড়া ইঁদুর, কচ্ছপ, শামুক, জোংড়া, কাঁকড়া ইত্যাদি খায়। শামুককে ওরা বলে 'ঘোঙা,' ইঁদুরকে বলে 'মোসা' আর শুকরকে বলে 'শুয়োর'। শামুক ভেঙে ভিতরের শাঁস বা মাংস বের করে তেলে ভেজে বা মাংসের মতো রান্না করে খেতে এরা পছন্দ করে। আর ঝিনুকের শাঁস রান্না করে পুঁইশাক দিয়ে। এসব ওদের কাছে খুব মজাদার খাবার। ওদের মাটির ঘরের বারান্দায় চুপচাপ বসেছিলো মুন্ডা কিশোরী ফুলঝুরি মুন্ডা।

Dhaka University Institutional Repository

এখন ওর স্কুলে যাবার বয়স। কিন্তু সে স্কুলে যায় না। আনমনা হয়ে কী স্বপ্ন বুনছিল মনে মনে কেবল সেইই জানে তা। ক'দিন পরই হয়ত বুঝে ওঠার আগেই মা বাবা ওর বিয়ে দিয়ে দেবে। চলে যেতে হবে এ ঘর ছেড়ে।''[৪৭]

সাধারণত মুন্ডারা এখনো বাবা মায়ের পছন্দ মতই বিয়ে করে। বিয়ের রীতি নীতিতে কিছুটা হিন্দুয়ানী ভাব থাকলেও পার্থক্য অনেক। পাত্রপাত্রী পছন্দ হলে বিয়ের দিন ঠিক হয়। সেদিন কনের বাড়ির উঠোনে ও বরের বাড়ির উঠোনে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। তবে বিয়ে হয় কনের বাড়িতেই। উঠোনে প্রায় ছয় ইঞ্চি উঁচু করে একটি মাটির বেদী তৈরি করা হয়। তার ওপর রাখা হয় জলপূর্ণ একটি পাত্র, প্রদীপ, সিঁদুরের কৌটা ইত্যাদি। এরপর চলের জলকাটা ও আগুল কাটা। কনের আগুল সামান্য কেটে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরানো হয়। একটি আমপাতার ওপরে সে রক্তের ফোঁটা লাগানো। হয়। ওই আমপাতা মুড়িয়ে তাবিজের মতো করে তা সুতো দিয়ে বরের হাতে বেঁধে দেয়া হয়। আর তার পায়ে কনে জল ঢালে। ছেলেকে পিঁড়িতে বসিয়ে তাকে পিঁড়িশুদ্ধ কয়েকজন মিলে উঁচু করে কনের চারিদিকে সাত বার ঘোরায়। কনে বসে থাকে। একে বলে সাত পাক ঘোরা। বর সাত দিন সে আম পাতা বেঁধে রাখে হাতে। এরপর খুলে জলে ফেলে দেয়। বিয়ের পর মেয়েরা শাখা সিঁদুর পড়ে।

পরিশেষে মৃত্যুঞ্জয় রায় তাঁর প্রবন্ধে বলেন, ''মুন্ডাদের জীবন এখনো শিক্ষার আলো পড়েনি। জমিদাররা তাদের সাথে পশুর মতো আচরণ করতো। তাদের জীবন ধারা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিও সেভাবে গড়ে ওঠে। পড়া লেখা, ধর্ম পালন, উৎসব-এসব যেন এক সময় ওদের কাছে ছিল নিষিদ্ধ বিষয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জয়দেব মুন্ডা, এসএসসি পাস তরুণ। ও ছাড়া ওখানে আর কেউ লেখাপড়া জানে না। তিনি এখন 'সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সমিতি'র একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে সুন্দরবনের আদিবাসীদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। কিছু বেসরকারী সংস্থা তাদের সাহায্য করছে। তিনি জানান 'বর্তমানে ৩১০ জন মুন্ডা এ সমিতির সদস্য।' তবে শুধু শ্যামনগরেই তিনি জরিপ করে দেখেছেন, এখানে ২২০০ জন মুন্ডা বসবাস করছে। সবচে বেশি মুন্ডাদের বাস কৈখালি গ্রামে। এছাড়া ভেটখালি, কালিঞ্চি, শৈলখানি, তারানিপুর, অন্তাখালি, শ্রীফলকাটি, মুন্সীগঞ্জ, চন্ডিপুর, তালবাড়িয়া, খাগরাহাট, গাবুরা ইত্যাদি গ্রামেও মুন্ডারা থাকে। খুলনার কয়রা উপজেলাতেও বেদকাশি গ্রামে আছে মুন্ডারা। তবে সুন্দরবনের আদিবাসী গোত্রের মধ্যে মুন্ডা ছাড়াও আছে কুর্ণী বা মাহাতো। এরা খুবই কম। ইদানিং মুন্ডা শিশুরা স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। পাড়ার মধ্যেই জনৈক ফাদার একটি স্কুল খুলেছেন শিশুদের জন্য। জয়দেব

Dhaka University Institutional Repository

জানান, 'আমার জানা মতে এ পর্যন্ত মুন্ডাদের ইতিহাসে শুধু একজনই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পেরেছে। তার নাম কৃষ্ণপদ মুন্ডা। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে অর্থনীতিতে পড়ছে।''[৪৮]

২.৫ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবনে শেখেরটেক

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবনের নলিয়ান ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে ৩০ কি.মি. দক্ষিণে শিবসা নদীর সাথে শেখের খাল ও কালীর খাল সংযোগ স্থলে শিবসা মন্দির পরিবেষ্টিত প্রত্নস্থল শেখেরটেক-এর অবস্থান। সুন্দরবনের পুরনো ২৩৩ লাটের (বর্তমান ৫২৫ নং ঘের) গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ১.৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আলোচ্য প্রত্নস্থলটির অবস্থান। শিবসা মন্দির কেন্দ্রিক আলোচ্য প্রত্নস্থলটি শেখেরটেক বা শেখের বাড়ী নামে পরিচিত। শেখেরটেক প্রত্নস্থলে দুটি মন্দিরের অবস্থান। একটি শিব মন্দির, অন্যটি কালী মন্দির। শিবসা নদীর তীরে মন্দিরদ্বয়ের অবস্থান। একটি শিব মন্দির, অন্যটি কালী মন্দির। শিবসা নদীর তীরে মন্দিরদ্বয়ের অবস্থান বিধায় সাধারণ্যে এটি শিবসা মন্দির বলে পরিচিত। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া তাঁর বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ গ্রন্থে লিখেছেন, ''শিবসা নদী থেকে যেখানে শেখের খাল ও কালীর খাল নির্গত হয়েছে, সেখানে ২৩৩ নম্বর লাটের অন্তর্গত শেখের টেক নামক স্থানে প্রাচীন ইমারতাদির বহু ধ্বংসাবশেষ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু সেখানে নদীর ভিতরেও প্রাচীন ইটের ভগ্নাংশ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এখানে দ্বিতল ইমারতের অস্তিত্ব ছিল''।[৪৯] সাম্প্রতিক কালে পরিচালিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদনে এই প্রত্নস্থলের পথ-নির্দেশ ও অবস্থানের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। বিবরণটিতে বলা হয়েছেঃ খুলনা শহর থেকে সড়ক পথে দাকোপ উপজেলা সদরে পৌঁছে সেখান থেকে সাইকেলে বা মটর সাইকেলে চেপে নলিয়ান লঞ্চ ঘাট থেকে ট্রলারে চড়ে প্রথমে শিবসা নদী ধরে অথবা চালনা থেকে পশুর নদী ধরে অগ্রসর হয়ে বন বিভাগের সুন্দরবন (পশ্চিম) ডিভিসনের আদাচাই টহল ফাঁড়ি (ইউনিট নং ৩) পেরিয়ে আরও দক্ষিণে শেখের কাল ধরে পুরানো ২৩৩ নং লাটের (বর্তমান ৫২৫ নং ঘের) গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ১.৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খালটির পশ্চিম পাড় থেকে ২০০ মি./২১৮.৭২ গজ পশ্চিম দিকে গভীর জঙ্গলের মধ্য হেঁটে গেলে বিভিন্ন স্থানে মোট ৫টি অনুচ্চ সাংস্কৃতিক ঢিবি ও মন্দিরের অবস্থান। বর্ণিত অঞ্চলটি ত্রিকোণাকার ও সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছুটা উঁচু।[৫০] এ প্রত্ন স্থলটি প্রায় ৬ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ শেখেরটেকের জনগোষ্ঠী

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে সুন্দরবনে এক সময় জন বসতি ছিলো। সুন্দরবন ঘন বসতি পূর্ণ শহর ছিলো না মধ্যে মধ্যে বসতি ছিলো অথবা বর্তমানের ন্যায় জঙ্গলহীন ছিলো এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখক তিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ব্লকম্যান বলেন যে সুন্দরবনে কোন এক সময়ে শহর, পথঘাট, এবং বাড়িঘর গড়ে উঠার চেষ্টা চলছে মাত্র। ক্যাপ্টেন মরিসন বরেন যে, সুন্দরবনে ঘনবসতি ছিলো এবং চাষাবাদ হতো। ব্লকম্যান এ মতের বিরোধী। তিনি বলেন যে, পর্তুগিজও ও ডাচ মানচিত্রে সুন্দরবনের যে পাঁচটি শহরের উল্লেখ আছে তা কিছুই প্রমান করে না। ওমালি বলেন যে, টোডর মলের জরিপে জানা যায় যে ষোড়শ শতাব্দিতে এখানকার ন্যায় জঙ্গল ছিলো। বিভারিজ বলেন সুন্দরবনের জঙ্গল এখন যে অবস্থায় আছে তখনও তেমনি ছিলো। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে বাঙ্গালি জাত অতীতকে অনেক বড় করে দেখে এবং তারা বলে যে, সুন্দরবনে বড় বড় শহর ছিলো। তবে আমি গবেষনায় দেখেছি সুন্দরবনে একসময় যে মনুষ্য বসতি ছিলো তার যথেষ্ট নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। তাই শেখেরটেকে এক সময় যে জনবসতি ছিলো তা পর্যবেক্ষক সহজেই অনুমান করা সম্ভব হয়।

অতি প্রাচীন কাল হতে এদেশে সুন্দরবনের অস্তিত্ব আছে। তবে পূর্বে যে সমস্ত স্থান জুড়ে সুন্দরবন ছিলো, এখন তার বহুস্থানে মনুষ্য বসতি ও ফসলের জন্য আবাদভূমি ও বিলে পরিণত হয়েছে। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পরও সুন্দরবন টিকে আছে, এটা আশার কথা। তোডরমল্লেও রাজস্ব তালিকা উদ্ধৃত করে মিঃ ব্লকম্যান দেখিয়েছেন যে, উত্তরদিকে প্রায় চারশ বছরের মধ্যে সুন্দরবনের কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কারণ এই সময়কার রাজস্বের পরিমাণ গড়ে প্রায় একরূপই ছিলো। সুন্দরবন অঞ্চলে মনুষ্য বসতি ছিলো এবং কোথাও কোথাও ছোট খাট নগর গড়ে ওঠেছিলো, তা আমরা আলোচনা করব। মুসলিম আমলের পূর্বে বৌদ্ধ ও আদিম অধিবাসীরাই এদেশের প্রধান বাসিন্দা ছিলো। প্রাচীন আমলের বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য নিদর্শন বৌদ্ধ জাতির অস্তিত্বেও প্রমাণ দেয়। মুসলমান আক্রমনের পূর্বে এদেশে কায়স্থ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ হিন্দুদের বসতি ছিলোনা বললেই চলে। মুঘল আমলে ভৈরব ও কপোতাক্ষী তীরে হিন্দু সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো।

আচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেনঃ "১৪শ, ১৫শ, ও ১৬শ শতাব্দীতে মুসলমান পীরগন প্রথম ধর্ম প্রচারক সুলভ উৎসাহ লইয়া এই যশোর অঞ্চলে ইসলাম ধর্মেও পতাকা বহন করেছিলেন এবং তথায় লোক বসতি গড়ে তুলেছিলেন। এ অঞ্চলের ইতস্ততঃ বহু গ্রামের নামই তাঁর জলন্ত সাক্ষ্য স্বরূপ হয়ে রয়েছে। যথা- ইসলামকাটী, মামুদকাটী, হোসেনপুর, হাসানবাদ(হোসেন-আবাদ) ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের এই অগ্রদূতের মধ্যে খাঞ্জা আলীর নাম সর্বপ্রধান। ইনিই ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বাগেরহাটের নিকট বিখ্যাত ষাট গম্বুজ নির্মাণ করেন। রাড়ুলীর প্রায় দশ মাইল দক্ষিনে আর একটি মসজিদও এই মুসলমান পীরের নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দিকেই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। ইসলাম খান তখন বাংলার সুবেদার। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এনায়েত খানের নেতৃত্বে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতাপের বিরুদ্ধে বিপুল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন। জনশ্রুত রয়েছে, তাঁকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার পথে বারাণসীতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকাল এবং শাসনকার্য সম্পর্কে লিখিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে এ সম্পর্কে জানার জন্য সহায়ক হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসহ অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। রাজা প্রতাপাদিত্যের শিবসা দুর্গ পরিবেষ্টিত প্রত্ন অঞ্চলটিতে খনন কার্য পরিচালিত হলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি ইতিহাস পুনর্গঠনের উপাদান হিসেবে গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হবে নিঃসন্দেহে।

শেখেরটেকে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সঠিক কোন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় রাজা প্রতাপাদিত্যেও শিবসা দূর্গ অথবা মোঘল আমলে নির্মিত কোন দূর্গ বলে অনুমান করেছেন। মন্দিরের অবস্থানের জন্য এই স্থান কালিবাড়ি বলে পরিচিত এবং এর দক্ষিন দিকের খাল, কালীর খাল নামে পরিচিত। এ স্থানকে অবশ্য কেউ কামার বাড়িও বলে। কালী বাড়ির এক মাইল দক্ষিন পূর্বে এবং কালির খালের উত্তর পাবে অনেক গুলো বাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ইষ্টক নির্মিত বাড়ির ভগ্নাবশেষ আছে। সেখানেও অনেক ইষ্টক নির্মিত বাড়ির ভগ্নাবশেষ আছে। এ অঞ্চলটি গড়ে ১০ বর্গমাইল হবে। এক কালে এখানে বহু লোকের বসবাস ও গমনাগমন ছিল তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। সম্ভবতঃ মগ পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে প্রজাগনকে রক্ষা করার জন্য মোঘল শাসকরা এখানে সামরিক ঘাটি নির্মাণ করেন এবং সেখানে সুন্দর লোকালয়গড়ে তুলে ছিলেন। আর মন্দিরটি হিন্দুরাজ কর্মচারীদের জন্য নির্মিত হয়ে থাকবে।

২.৭ শেখেরটেকের জনগোষ্ঠী স্থানান্তরিত

বিভিন্ন আলোচনা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট তা হলো শেখেরটেকে এক সময় জনবসতি ছিলো। সুন্দরবনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নগরী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় শেখেরটেকে এক সময় জনবসতি গড়ে তোলা হয়েছিলো। তবে এই স্থানে কোন কবর এর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে আগেই বলা হয়েছে এ অঞ্চল

Dhaka University Institutional Repository

পরিদর্শন দুঃসাহসিক ও কষ্টসাধ্য বিষয়। বিপদ সংকুল হবার কারনে এখানে বেশিক্ষণ থাকাও সম্ভব নয়। তাই সরকারি পৃষ্টপোষকতা বা বড় প্রজেক্ট ছাড়া এই অঞ্চলের সত্যিকার রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব নয়। সুন্দরবনের গহীনে অবস্থিত এই অঞ্চল মানুষের বসবাসের জন্য কখনই অনুকুল ছিলো। তাছাড়া সুন্দরবনে বিভিন্ন সময়ে ভূমিকম্প হয়েছে যার ফলে সুন্দরবনের উত্থান ও পতন হয়েছে। সেই ধারা বাহিকতায় শেখের টেকের জনগোষ্ঠী স্থানান্তারিত হবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সুন্দরবনের উত্থান পতনের মুলে প্রাকৃতিক দূর্যোগে অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। মগদের আক্রমন থেকে এই অঞ্চলের মানুষকে রক্ষা করার জন্য রাজা প্রতাপাদিত্য এখানে দূর্গ গড়ে তোলেন। কিন্তু ঝড় জলোচ্ছাসের কারণে এই এলাকার জনগোষ্ঠী স্থানান্তরিত হয়ে থাকতে পারে। তাই যদিও গবেষণার শিরোনামে বলা হয়েছে বিলুপ্ত জনগোষ্ঠী তবে এখানে বিলুপ্ত বলতে জনগোষ্ঠীর বসবাসের সমাপ্তিকে বুঝানো হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তে আসা কষ্টসাধ্য যে তারা স্থানান্তিরিত হয়েছিলো নাকি প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের বসবাসের সমাপ্তি ঘটেছিলো।

২.৮ গবেষণা ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা

কোন রকমের সংস্কার নেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন এ প্রত্ন তাত্ত্বিক নিদর্শনের। যার ফলে অন্যদের অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে এখানকার কালি মন্দির ও শিব মন্দির। তাছাড়া অন্য যে ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তা হারিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে ঢিবিগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

১ম ঢিবিঃ এর ওপর কয়েকটি গাবগাছ ব্যতীত উল্লেখ করার মতো অন্য কিছু নেই। তবে ঢিবিটিতে যে এক সময় বসতি ছিলো তা মাটির শক্ত গঠন এবং বাদামি আভা দেখে অনুমান করা যায়। তাছাড়া প্রায় সর্বত্রই এলোপাতাড়ি এগুলো নিম্নমানের ছেটেগড়া ধরনের ইট। কিন্তু কোনো স্থানেই কোনো দেয়াল বা মেঝের চিহ্ন দৃশ্যমান অবস্থায় নেই।

২ নং ঢিবিঃ উপরিভাগের সর্বত্রই ইট-পাটকেলের ছড়াছড়ি। ইটগুলোর গড় পরিমাপ ১৭ সেমি./৬.৭´ X ১৩ সেমি./ ৫.৩´ X ৪.৫ সেমি./১.৬´। কিন্তু ঢিবির কোনো প্রান্তে কোনো অটুট গাঁথুনির চিহ্ন প্রকাশ্য অবস্থায় নেই। তবে যা কিছু অবশিষ্ট আছে তার ওপর নির্ভর করে এই ঢিবির সময়কাল ১ম ঢিবির অনুরূপ বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

অনুমান করা যায়। শিখর পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং এর ওপর নানা ধরনের পরগাছাসহ বুনোগাছ জন্মেছে। ফলে মূল আদল ১৯১৪ সালের দিকেও বোঝার উপায় ছিলো না। ভিতর দিকে ছাদ আধাবৃত্তাকার। উত্তর দেয়ালে একটি কুলঙ্গি আছে। বাইরের দিকে দেয়াল পলেস্তরাবিহীন। তবে সতীশ চন্দ্র মিত্র লিখেছেন যে অতীতে কার্নিসের নিচে কিছু কারুকাজ ছিলো। তাছাড়া উত্তর দেয়ালে পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল খচিত দেয়াল-খিলান নক্শা রয়েছে। বর্তমানে অত্যন্ত জরাজীর্ণ এবং বোঝার উপায় নেই। তবে কোনো কোনো স্থানে মূল নক্শার ছিটেফোটা চিহ্নিত করা সম্ভব। দক্ষিণ দিকের অংশ ক্ষতিগ্রস্থ এবং যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে। খিলানগুলো কৌণিক এবং পরত বিশিষ্ট এগুলো চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিলো। সময়কাল আনু. খ্রিস্টীয় সতের শতক। মন্দির এখন জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সংরক্ষনের অভাবে অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে।

শেখেরটেক কালী মন্দির এক সময় যে কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে তার প্রমানে কিছু দিনের ব্যবধানে দু'টি সময়ে ছবি উপস্থাপন করলাম তুলনা মুলক পর্যবেক্ষণের জন্য।

শেখেরটেকের কালী মন্দিরের ছবি - ২০১০

শেখেরটেকের কালী মন্দিরের ছবি - ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট শেখের টেক

পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্র'র পলিমাটি দিয়ে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় গড়ে ওঠা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ, জোয়ার-ভাটা বিধৌত সুন্দরবন। বনটি ২১° ৩৯ থেকে ২২° ৩০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯° ১২ থেকে ৮৯° ২৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ বন সাতক্ষীরার শ্যামনগর, খুলনার কয়রা ও দাকোপ এবং বাগেরহাটের মংলা, মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত।[৫১] মধ্যযুগে সুন্দরবন পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি নদীর তীরবর্তী দক্ষিণ ডায়মন্ড হারবার থেকে পূর্বের বাগেরহাট, দক্ষিণ যশোর ও হরিণঘাটা হয়ে ফকিরহাট, সাতগাঁও হয়ে খলিফাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। সুন্দরবনের বর্তমান অবস্থানের বয়স তিন হাজার বছরের বেশি হবে না। কিন্তু ওই সময়ের আগেও সুন্দরবন ছিলো। সেটা ছিলো আরও উত্তরে।[৫২] ১৭৭৯ সালে মেজর জেমস রেনেল এই এলাকার ভূ-প্রকৃতি মানচিত্রে প্রদর্শন করেন।[৫৩] সুন্দরবনের অনেক স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করে নিয়মিতভাবে চাষাবাস শুরু হয় ১৮৩০ সালের পর থেকে। ১৮৬২ সালে বার্মার বনরক্ষক ব্রান্ডিস সর্বপ্রথম সুন্দরবনকে সংরক্ষনের দাবি তোলেন। ১৮৭৬ সালের বন আইন অনুযায়ী বৃহত্তর খুলনা জেলার যে অংশটুকু ইংরেজরা সংরক্ষিত অরণ্য ঘোষণা করেছিলো, মোটামুটি তাই এখনো সরকারি নথিতে বাংলাদেশের সুন্দরবন। পরে ১৭৮৪ সালে তৎকালীন যশোর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হিঙ্কেল[৫৪] জমিদারদের কাছ থেকে সুন্দরবনকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করেন। ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ সরকার সুন্দরবনের স্বত্বাধিকার অর্জন করে। সুন্দরবন ১৮৮৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন জমিদারের অধিনে ছিলো। ১৮৭৮ সালে সমগ্র সুন্দরবন এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় এবং ১৮৭৯ সালে সুন্দরবনের দায়-দায়িত্ব বন বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়।[৫৫] জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দির শুরুতে মূল সুন্দরবনের আয়তন ছিলো প্রায় ১৬ হাজার ৭০০ বর্গকিলোমিটার, যা বর্তমানের প্রায় দ্বিগুণ। তবে এ বনের ওপর মানুষের অধিক চাপ ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ক্রমান্বয়ে এর আয়ত সংকুচিত হয়ে আসছে।[৫৬] এ বনের আয়তন দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৪.২ শতাংশ এবং সমগ্র বনভূমির প্রায় ৫০ শতাংশ।[৫৭] এ এলাকার ৭০ শতাংশ ভূমি গাছ আচ্ছাদিত।[৫৮] এ বনের বর্তমান মোট আয়তন ৬ হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে স্থলভাগের পরিমাণ ৪ হাজার ১৪৩ বর্গকিলোমিটার (যা সমগ্র সুন্দরবনের ৬৮.৮৫ শতাংশ) এবং জলভাগের পরিমাণ ১ হাজার ৮৭৪ বর্গকিলোমিটার (যা সমগ্র সুন্দরবনের ৩১.১৫ শতাংশ)।[৫৯] আবার বনের মোট আয়তনের মধ্যে ৩,৮০,৩৪০ হেক্টর উন্নত বনভূমি ও ২৬,৮০৭ হেক্টর অপ্রধান বনভূমি এবং ১,৬৯,৯০৫ হেক্টর জলাভূমি।[৬০] এছাড়া প্রায় ৪০০ টি নদী-নালা, খালসহ

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় ২০০টি ছোট-বড় দ্বীপ ছড়িয়ে আছে এ বনে।[৬১] এ বন মূলত তিনটি এলাকার সমন্বয়ে গঠিত, যথা-সুন্দরবন পশ্চিম (৯,০৬৯ হেক্টর), সুন্দরবন দক্ষিণ (১৭,৮৭৮ হেক্টর) এবং সুন্দরববন পূর্ব (৫,৪৩৯ হেক্টর)। সুন্দরবনের রয়েছে চারটি প্রশাসনিক রেঞ্জ-বুড়িগোয়ালিনী, খুলনা, চাঁদপাই এবং শরণখোলা; আর ১৬টি ফরেস্ট স্টেশন। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এ বনকে ৯টি ব্লক এবং ৫৫ টি কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা হয়েছে। ১৮৭৫ সালে এ বনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আর বাংলাদেশ বণ্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ (সংশোধন), ১৯৭৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে সুন্দরবনের অভয়ারন্যগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬২] ইতোমধ্যে এ বনভূমির প্রায় ৩২,৪০০ হেক্টর এলাকাকে বণ্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া এ বনাঞ্চল সংরক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো গত ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সুন্দরবনকে কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন। রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর চিত্রল হরিণের আবাস স্থল হিসেবে সুন্দরবন বিখ্যাত। বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে সুন্দরবনকে ঘোষণা করা হয়েছে। জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায় সুন্দরবন গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে আসছে। এ বনে আছে নানা ধরনের গাছ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সুন্দরী, কেওড়া, গরান, বাইন, গেওয়া, কাকড়া। বনে বাস করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বানর, হরিণ, শুকর, অজগর ইত্যাদি। সুন্দর বনের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে আছে নদ-নদী, খাল ও শাখা খাল। নদীতে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের মাছ। আর নদীতে বাস করে অসংখ্য কুমির। সুন্দরবনে আছে ৩৫টি প্রজাতির সরীসৃপ, ২৭০ প্রজাতির পাখি ও ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। এ বনে সুন্দরী গাছ প্রধান বলে হয়তো সুন্দরবন নাম হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সুন্দরবন সমুদ্রের কাছে বলে হয়তো সুন্দরবন নাম হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সুন্দরবন সমুদ্রের কাছে বলে 'সসুন্দর' শব্দ থেকে প্রথমে 'সমুন্দরবন' ও পরে 'সুন্দরবন' নাম হয়েছে। প্রায় দু'হাজার বছর আগে গাছেয় বদ্বীপ এলাকায় সুন্দরবন সৃষ্টি হয় বলে ঐতিহাসিকরা ধারণা করেছেন। বৃহত্তর খুলনায় সুন্দরবনের আয়তন ৫ হাজার ৭শ ৪ বর্গ কিলোমিটার। সুন্দরবনের পানি লোনা। তবে কোন কোন স্থানে মিষ্টি পানিও পাওয়া যায়। ১৭৫৪ সালে সুন্দরবনের মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়। সুন্দরবনের প্রশাসনিক বিভাগ সৃষ্টি করা হয় ১৮৫৭ সালে। আর ম্যানেজমেন্ট প্লান ১৮৯২ সালে শুরু করা হয়। সুন্দরবন বিভাগের অধীনে আছে ৪টি প্রশাসনিক রেঞ্জ। সুন্দরবন বন বিভাগের দায়িত্বে আছেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা। এ কর্মকর্তার অফিস খুলনা শহরে। সুন্দরবনের অনেক কিছু মানুষের জানা থাকলেও আবার অজানাও রয়ে গেছে অনেক দিক। সুন্দরবনে এক সময় জনবসতি ছিলো। তবে এ জনবসতি কখন থেকে শুরু হয়েছিল তার সঠিক তথ্য আজও পাওয়া যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দরবনের জনবসতিকে কেন্দ্র করে ছোট বড় শহর বা নগরীও গড়ে ওঠেছিল। তার মধ্যে ছিলো শেখেরটেক নগরী। যার অনেক চিহ্ন আজো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পুরাতাত্ত্বি মোঃ মোশারফ হোসেন বলেছেন, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে, গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমি প্লুটো প্রমূখ গঙ্গা নদের মোহনায় কয়েকটি বন্দর শহর ছিলো বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু সে সবের হদিস আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এরপর চব্বিশ পরগনা জেলার অধীন সুন্দরবন অংশে একটি লিপি উৎকীর্ণ তামার ফলক পাওয়া যায়। সে তামার ফলোকের পাঠোদ্ধারের পর জানা গেলো, খিষ্টীয় বার-তের শতকের দিকে সুন্দরবন অঞ্চলে ডোম্মান নামে একজন শাসক খাড়ি নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর আগে পাল আমলে এ অঞ্চলকে ব্যাঘ্রতট মন্ডল বলা হতো। কিন্তু কোথায় ছিলো এসব রাজ্য ও মন্ডলের রাজধানী।[৬৩] তবে শেখেরটেক কোন রাজ্য ছিলো না। তবে একটি নগর গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছিলো। তবে নগর প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণেই হয়তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। যতদূর জানা যায় মোঘল সম্রাট আকবরের শাসন আমল থেকে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় পর্যন্ত আরাকানী মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুগণ জলপথে এসে এদেশ লুন্ঠন করতো।[৬৪] সুন্দরবনেও মগ ও পাশ্চত্য দেশ থেকে আগত ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিলো। এ জলদস্যুদের দমন করার জন্য মুঘল আমলের কোন এক সময়ে সুন্দরবনে শেখেরটেক দূর্গ নির্মাণ করা হয়েছিলো। এ দুর্গের উপ সেনাপতি ছিলেন জনৈক শেখ। তবে এই উপ-সেনাপতির প্রকৃত নাম কি ছিলো জানা যায় না। তবে তিনি একজন মুসলমান ছিলেন। ব্লকম্যান বলেছেন, সুন্দরবনে কোন এক সময়ে শহর পথঘাট এবং বাড়িঘর গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিলো। ক্যাপ্টেন মরিসন বলেছেন, সুন্দরবনে ঘনবসতি ছিলো এবং চাষাবাদ হতো। বিভারিজ বলেছেন সুন্দরবনে বড় বড় শহর ছিলো। এতেই বোঝা যায় শেখেরটেকেও একটি নগর গড়ে উঠেছিলো।

৩.২ সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি থেকে শেখেরটেক

খুলনা শহর থেকে সড়ক পথে দাকোপ উপজেলা সদরে পৌঁছে সেখান থেকে সাইকেল বা মোটর সাইকেলে চড়ে নলিয়ান লঞ্চঘাট থেকে ট্রলারে চড়ে প্রথমে শিবসা নদী ধরে অথবা চালনা থেকে পশুর নদী ধরে অগ্রসর হয়ে বন বিভাগের সুন্দরবন (পশ্চিম) ডিভিসনের আদাচাই টহল ফাঁড়ি (ইউনিট নং ৩) পেরিয়ে আরও দক্ষিণে শেখের খাল ধরে পুরনো ২৩৩ নং লাটের (বর্তমান ৫২৫ নং ঘের) গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ১.৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খালটির পশ্চিম পাড় থেকেক ২০০মি./২১৮.৭২ গজ পশ্চিম দিকে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলে বিভিন্ন স্থানে মোট ৫টি অনুচ্চ সাংস্কৃতিক ঢিবি ও একটি মন্দিরের অবস্থান। বর্নিত এলাকাটি ত্রিকোণাকার এবং সুন্দরবনের অন্যান্য সংলগ্ন এলাকা থেকে কিছুটা উঁচু। এই এলাকায় নিম্নোক্ত প্রত্নস্থলগুলোর অবস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

১ম ঢিবিঃ বনের সাধারন সমতল জমিপিঠ থেকে উচ্চতা ১.২ মি./৪-০´´ এবং বিস্তৃতি ১৩.৮মি./৪৫-৪´´ X ১২.১৯ মি. / ৪০- ০´´। এর ওপর কয়েকটি গাবগাছ ব্যতীত উল্লেখ করার মতো অন্য কিছু নেই। তবে ঢিবিটিতে যে এক সময় বসতি ছিলো তা মাটির শক্ত গঠন এবং বাদামি আভা দেখে অনুমান করা যায়। তাছাড়া প্রায় সর্বত্রই এলোপাতাড়ি ইট ও পাটকেল ছড়িয়ে আছে। কোনো কোনো অক্ষত ইটের পরিমাপ ১৭.৬ সেমি. X ১৩ সেমি. X ৪.৫ সেমি., ১৪ সেমি. X ১৪ সেমি. X ৪.৫ সেমি., ১৪ সেমি. X ১৩ সেমি. X ৩.৫ সেমি. এবং ১৬ সেমি. ১২ সেমি. X ৪ সেমি.। এগুলো নিম্নমানের ছেটেগড়া ধরনের ইট। কিন্তু কোনো স্থানেই কোনো দেয়াল বা মেঝের চিহ্ন দৃশ্যমান অবস্থায় নেই। তবে খনন করা হলে কোনো ভিত-নক্শা অনাবৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত পাওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করে অনুত হয় যে, ইটগুলো গাঁথার জন্য কাদামাটি ব্যবহৃত হয়েছিলো। সুতরাং এর সময়কাল বড়জোড় খ্রিস্টিয় সতের-আঠারো শতকে পিছিয়ে ধরা যায়।

২ নং ঢিবিঃ উল্লিখিত ঢিবি থেকে বনের মধ্যে করে আরও অনধিক ১.৬ কিমি. (০.৯৯ মাই) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দ্বিতীয় ঢিবি দেখা যায়। এর উচ্চতা ১.২ মি./৪-০´´। পাদদেশের দৈর্ঘ্য ১৩.৭ মি./৪৫-০´´ ও প্রস্থ ১৩.৭ মি./৪৫-০´´। এর মাটির বয়ন শক্ত এবং রং বাদামি। উপরিভাগের সর্বত্রই ইট-পাটকেলের ছড়াছড়ি। ইটগুলোর গড় পরিমাপ ১৭ সেমি./৬.৭´´ X ১৩ সেমি./ ৫.৩´´ X ৪.৫ সেমি./১.৬´´। কিন্তু ঢিবির কোনো প্রান্তে কোনো অটুট গাঁথুনির চিহ্ন প্রকাশ্য অবস্থায় নেই। তবে যা কিছু অবশিষ্ট আছে তার ওপর নির্ভর করে এই ঢিবির সময়কাল ১ম ঢিবির অনুরূপ বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

৩য় ঢিবি ঃ ২নং ঢিবির ১.৫ কিমি./০.৯৩ মাইল উত্তর দিকে এই ঢিবির অবস্থান। এর উচ্চতা পাশের জমিপিঠ থেকে ১.৮ মি.৬-০´´। এর দৈর্ঘ্য ৫৩.৩মি./১৭৫ মি./ ১৭৫-০´´ এবং প্রস্থ ২৪.৩ মি./ ৮০-০´´। এই ঢিবির মাটির রং বাদামি আভাযুক্ত কালচে এবং বয়ন শক্ত। কোনো কোনো স্থানে ইট আহরণকারীদের দ্বারা খনিত বিভিন্ন আকারের খাদের চিহ্ন রয়েছে। এসব খাদসহ ঢিবির বিভিন্ন অংশে প্রচুর ইট-পাটকেল বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে আছে। অক্ষত অবস্থায় পাওয়া ইটের পরিমাপ ২১ সেমি. X ১৭ সেমি. X ৪.৫ সেমি., ১৮ সেমি. X ১৭ সেমি. X ৫ সেমি. X ৫ সেমি., ১৯ সেমি. X ১৪ সেমি. X ৫ সেমি., ১৩ সেমি. X ১৫ সেমি. X ৪.৫ সেমি., ১৬ সেমি. X ১৬ সেমি. X ৪ সেমি., ১৬ সেমি. X ১৩ সেমি. X ৪ সেমি. এবং ২১ সেমি. X ১৫ সেমি. X ৫ সেমি.। কোনো কোনো ইটের গায়ে সুরকির চিহ্নও লেগে আছে। তাই অনুমিত হয় যে, এই ঢিবিতে অতীতে কোনো স্থাপনার

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্ব ছিলো। কিন্তু বিলুপ্ত স্থাপনাটির পরিকল্পনা পুনরুদ্ধারের উপযোগী দেয়ালের চিহ্ন আজ আর অবশিষ্ট নেই। তবে ইটের পরিমাপের ওপর নির্ভর করে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া স্থাপনাটিকে ১ নং ও ২নং ঢিবির বিলুপ্ত স্থাপনার পরবর্তী যুগীয় নির্দন বলে প্রতিভাত হয়। বন বিভাগের সুপারভাইজার মোঃ হানিফ মজুমদার মৌখিকভাবে অবহিত করেন যে, কিছু দিন পূর্বে এ ঢিবিতে একটি পুরনো মাটির কলসি এবং মাইট (পোড়ামাটির বড় আকারের কলসি) আধাপ্রোথিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

৪র্থ এবং ৫ম ঢিবিঃ এ অংশে পাশাপাশি দু'টি ঢিবি রয়েছে। ৩য় ঢিবির ১.৫ কিমি. উত্তরে এগুলোর অবস্থান। একটি ঢিবির দৈর্ঘ্য ১৯.৮ মি/৬৫-০´´ এবং প্রস্থ ১৫.২ মি./৫০-০´´। উভয় ঢিবি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। এদের সর্বত্রই কেবল পাটকেলের ছড়াছড়ি। অক্ষত ইটের সংখ্যা একেবারেই কম। কোনো কোনো ইটের পরিমাপ ১৬ সেমি. X ১৪ সেমি. X ৫ সেমি., ১৭ সেমি. X ১৫ সেমি. X ৪ সেমি., ১৭ সেমি. X ৫ সেমি., ১৬ সেমি. X ১৬ সেমি. X ৪ সেমি. এবং ১৬ সেমি. X ১৪ সেমি. X ৩.৫ সেমি.। কিন্তু কোনো ঢিবির কোনো স্থানেই ইটের গাঁথনির চিহ্ন দেখা যায় না। অথচ মাটির বয়ন শক্ত এবং রং কালচে ও বাদামি আভাযুক্ত। কোনো কোনো পাটকেলকে খোলামকুচির অনুরূপ মনে হয়। সুতরাং এই ঢিবিতে অতীতে কোনো বসতবাড়ির অস্তিত্ব ছিলো। তাছাড়া ঢিবি দু'টির উচ্চতা ও অন্যান্য ঢিবির তুলনায় বেশি। তাই খনন কাজ পরিচালনা করা হলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া স্থাপনার ভিত অংশ অনাবৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুন্দরবনের বাওয়ালি (গাছ কাটায় নিয়োজিত শ্রমিক) ও মৌয়ালরা (সুন্দরবনের গাছ থেকে মধু সংগ্রহকারী) এ ঢিবি এবং এগুলোর সংলগ্ন স্থানকে 'বড়বাড়ি' নামে চিহ্নিত করে থাকে। আবার সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর-খুলনা ইতিহাস' গ্রন্থে অনুমান করেছেন যে, এটিই বার ভূঁইয়া নেতা প্রতাপাদিত্যের 'শিবসাদুর্গ'। তিনি এ এলাকার আশে পাশে গত শতকের গোড়ার দিকে উঁচু প্রাচীরের অস্তিত্ব ছিলো বলেও উল্লেখ করেছেন। তবে আলোচ্য জরিপ কালে তেমন কোনো প্রাচীরের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়নি। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, ১ম, ২য় ও ৩য় ঢিবিগুলোকেই তিনি হয় তো প্রাচীর হিসাবে গণ্য করেছেন। এর উত্তরে-পশ্চিম কোণে আরও একটি ঢিবি আছে। বাওয়ালি একে 'শিবমন্দির বলে।

শিব মন্দিরঃ বর্তমানে এর আকৃতি ঢিবির অনুরূপ। এর পাদদেশের পরিমাপ ২৪.৩ মি./৮০-০´´ X ১৬.৭ মি./৫৫-০´´ এবং উচ্চতা ২১ মি./৭-০´´। এর জমি পিঠের সর্বত্রই নানা আকৃতির পাটকেল ছড়িয়ে আছে। দু'টি স্থানে দু'টি দেয়ালের কিছু চিহ্ন দেখা যায়। অনুমিত হয় যে, ১৭ সেমি. X ১৫ সেমি. X ৫ সেমি. আকার বিশিষ্ট ইট-সুরকি দিয়ে এর দেয়াল তৈরী হয়েছে এবং এ স্থলে ৪.২৬ মি./১৪-০´´ বর্গাকার একটি দক্ষিণমুখী এক কোঠাবিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

ইমারত ছিলো। দরজার চারপাশে কারুকাজ করা ইটের তৈরি ফ্রেমের চিহ্নও কয়েকটি স্থানে লক্ষ করা গেছে। দেয়ালের গড় উচ্চতা ৩০.৪ সেমি./ ১-০´। এ ঢিবি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুদূর এগিয়ে গেলে একটি পুকুর এবং পুকুর ঘিরে বেশ কিছু ইট-পাটকেল ছড়িয়ে রয়েছে। আর এরই মধ্যে কেবল গাব গাছের ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। এসবের এক প্রান্তে গভীর বন ও নিচু জমি সংলগ্ন স্থানে 'কালীর খাল' নামে অত্যন্ত সরু একটি প্রবাহ দক্ষিণের জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে। কালীর খালের পাড়ে রয়েছে একটি সুন্দর মন্দির। বাওয়ালি ও মৌয়ালদের কাছে এটি 'কালী মন্দির' নামে পরিচিত।

কালী মন্দিরঃ এটি একটি নিরেট মঞ্চের ওপর দাঁড়ানো। মঞ্চের উচ্চতা ১.৬২ মি./ ৫-৩´ এবং এটি বর্গাকার (৬.৭ মি./২২-০´)। মূল মন্দিরটি এক কোঠা বিশিষ্ট। এর ভিতরের দিকে প্রতি বাহুর পরিমাপ ৩.২০ মি./১০-৬´ এবং বাইরের দিকে ৬.৪ মি./২১-৩´। এর দক্ষিণ ও পশ্চিমে একটি করে খিলান-দরজার চিহ্ন আছে। প্রতিটি খিলান দু' কেন্দ্রিক আধাগোলাকার এবং একটি সামান্য উত্তল ফ্রেমে আবদ্ধ। কোণগুলো কৌণিক এবং ব্যান্ড যুক্ত। কার্নিস কেমন ছিলো তা ভাঙ্গা অবস্থার জন্য বোঝা কঠিন। তবে এটি তিনধাপ বিশিষ্ট ছিল বলে অনুমান করা যায়। শিখর পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং এর উপর নানা ধরনের পরগাছাসহ বনোগাছ জন্মেছে। ফলে মূল আদল ১৯১৪ সালের দিকেও বোঝার উপায় ছিলো না। ভিতর দিকে ছাদ আধাবৃত্তাকার। উত্তর দেয়ালে একটি কুলঙ্গি আছে। বাইরের দিকে দেয়াল পলেস্তরাবিহীন। তবে সতীশ চন্দ্র মিত্র লিখেছেন যে অতীতে কার্নিসের নিচে কিছু কারুকাজ ছিল। তাছাড়া উত্তর দেয়ালে পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল খচিত দেয়াল-খিলান নকশা রয়েছে। বর্তমানে অত্যন্ত জরাজীর্ণ এবং বোঝার উপায় নেই তবে কোনো কোনো স্থানে মূল নকশার ছিটেফোটা চিহ্নিত করা সম্ভব। দক্ষিণ দিকের অংশ ক্ষতিগ্রস্থ এবং যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে। ইটের গড় পরিমাপ ১৭ সেমি. X ১৫ সেমি. X ৫ সেমি.। খিলানগুলো কৌণিক এবং পরত বিশিষ্ট এগুলো চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিলো। সময়কাল আনু. খ্রিস্টীয় সতের শতক।

উপরোক্ত সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টীয় সতের শতকে পশুর ও মর্জাল নদীর মধ্যবর্তী উঁচু জমিতে অবস্থিত 'শেখেরটেক' নামক স্থানের আশেপাশে শেখের খাল ও কালীর খালকে কেন্দ্র করে একটি বিস্তীর্ণ জনপদের অস্তিত্ব ছিলো। কিন্তু সে জনপদ বর্তমানে বিরান অবস্থায় আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ পর্যবেক্ষণে সুন্দরবনের শেখেরটেক

বর্তমানে সুন্দরবন বিভাগের নালিয়ান রেঞ্জের আদা চাই টহল ফাঁড়ি এলাকায় শেখেরটেক অবস্থিত। 'আদা' শব্দ আরবি। যার অর্থ আদায়। আর চাই শব্দটি ফারসি। অর্থ চাওয়া। এতে প্রমাণ করা যায় যে, আদা চাই এলাকায় শেখেরটেক নগরীর রাজস্ব আদায়ে কোন দপ্তর ছিলো। আদায় চাওয়া কেন্দ্র করে নাম হয়েছে আদা চাই। শেখের টেক নগরের অবস্থান ছিলো বেশ কয়েক বর্গ মাইল। এ নগরীতে ছিলো পাকা অসংখ্য দালান কোঠা, দুর্গ, লোকালয়, হিন্দু রাজ কর্মচারীদের জন্য মন্দির, পোস্তবাধা পুকুর, বাড়ির চারপাশে প্রাচীর ছিল। সুন্দরবনের দাছ নয় এমন বেশ সংখ্যক গাছ রোপন করা হয়েছিলো। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো গাব গাছ। তাছাড়া আরো অনেক কিছু ছিলো বলে শোনা যায়। এখন আর শেখেরটেকে কোন বাড়িঘর নেই। আছে পাকা বাড়িঘরের ধ্বংসস্তুপ। মজে বা ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুরের চিহ্ন। তবে অনেক জায়গায় এখনো গাব গাছগুলো দাঁড়িয়ে কালের স্বাক্ষী বহন করছে। আছে আধা ভগ্ন একটি মন্দির। এগুলো এখনো গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। সেখানে যাওয়া ব্যয় বহুল নানা রকম বিপদের আশংকা আছে। সেখানে গেলে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয় বাঘের আক্রমন। যে কোন সময় রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে। খুব সতর্কতা অবলম্বন করে অস্ত্রধারী সেন্ট্রী ছাড়া সেখানে যাওয়া কোন রূপেই উচিত নয়।

খুলনা থেকে নদী পথে নলিয়ানের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। নলিয়ান থেকে শেখেরটেকের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। আমি খুলনার ফরেস্ট ঘাট থেকে জলযান যোগে রূপসা, কাজিবাছা, চুনকুড়ি, ঢাকি নদী দিয়ে শিবসা নদীতে যেয়ে নলিয়ানে যাই। নলিয়ান থেকে আর একটি মজবুত জলযান যোগে শেখেরটেকে গিয়েছিলাম। সাথে অস্ত্রধারী সেন্ট্রিও ছিলো। জলযানে আদা চাই পৌছে যন্ত্রচালিত ডিংগি নৌকায় করে শিবসা নদীর পূর্ব পাড় ধরে পৌছেছিলাম শেখেরটেকে। আদা চাই থেকে দক্ষিণ শেখেরটেকের দূরত্ব প্রায় দু-কিলোমিটার। শিবসা নদী থেকে পূর্ব দিকে গিয়েছে কালীর খাল। আর কালীর খালের উত্তরে কিছু দূর এগিয়ে রয়েছে শেখের খাল। এ খাল দিয়ে পূর্বে কিছুদূর এগিয়ে গেলে দক্ষিণ দিকে পাওয়া যাবে একটি ছোট শাখা খাল। শেখের খালের দু'পাশ দিয়ে অন্যান্য গাছ পালার সাথে সারি সারি রয়েছে হলুদ বর্ণের হেতাল গাছ দেখলাম। আর হেতাল গাছে খেজুরের কাধির মত কাধি ঝুলতে দেখেছি। পড়ন্ত বিকেলে এ দৃশ্য আমাকে দারুনভাবে মোহিত করেছিলো। শেখের খাল থেকে শাখা খাল ধরে যেয়ে একটি স্থানে নামলাম। এবার যেতে হবে বনের ভিতর। সামনে ডিংগির মাঝি নানা রকম ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চললো। তার পেছনে একজন অস্ত্রধারী সেন্ট্রি আর আমার পিছনে ছিলো আর একজন অস্ত্রধারী সেন্ট্রি। কোন পথ নেই। আঠালো মাটির কাদায় ভরা। তারপর কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হবার কারণে

Dhaka University Institutional Repository

চলা দুরুহ হয়ে পড়ে। সূর্য তখন ডুবুডুবু অবস্থায় ছিলো। কিন্তু বনের মধ্যে মনে হলো সন্ধ্যা শুরু হয়ে গেছে। পথে দেখলাম গাছের ঘন গুড়ি, গুলো। এখানে বাঘের উৎপাত আছে। এমন একটা পরিবেশে শংকায় বুক কেঁপে কেঁপে ওঠতে লাগলো। শাখা খালে বাধা ডিংগি নৌকা থেকে প্রায় ২শ গজ বিপদ সংকুল পথ অতিক্রম করে কালী মন্দিরের কাছে পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের ইট ক্ষয়ে গেছে। বিক্ষত ছাদের উপর গাছপালা জন্মে আছে। কালী মন্দিরের আশেপাশে পাকা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম। কালী মন্দিরটি সুন্দরবনের একটি প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন। পূর্বদিকে এরূপ কোন কুলুঙ্গ বা জানালার খাত নেই। মন্দিরের বাইরের ইষ্টকে দেওয়ালের কার্নিসে নানা কারুকার্য আছে। উত্তর দিকে দেয়ালে ইস্টক দ্বারা এক প্রকার জাল বা ঝাপরী প্রস্তুত করা আছে। দক্ষিণ পাশে জমি অনেক বসে গেছে। সেজন্যে জঙ্গল হয়েছে এবং জোয়ারের জল মন্দিরের মূল পর্যন্ত আসে। সুতরাং সেদিকে মন্দিরের গায়ে একটু লোনা ধরেছে। অন্যসব দিকে জমি উঁচু আছে জল উঠে না; এজন্য লোনা ধরেনি। মন্দিরের শিরভাগে কতকগুলি গাছ জন্মেছে। কালে যা এ অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শন বিলুপ্ত করবে। এ মন্দিরের ইটের অলংকরন দেখে আমরা খ্রীষ্টীয় সতেরো-আঠারো শতকের শৈলী বিদ্যমান আছে বলে ধরতে পারি। তারপর সেখান থেকে তাড়াতাড়ি হেটে এসে ডিংগি নৌকায় ওঠলাম। সন্ধ্যা তখন নামতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি শেখেরটেক দিয়ে এসে শিবসা নদীতে ফিরে এলাম। তারপর আধা কিলোমিটার পূর্ব পাড় দিয়ে এগিয়ে শিবসার পাড়ে ডিংগি নৌকা বেধে শেখেরটেকের শেখের বাড়ির ধ্বংস স্তুপ দেখলাম ও ছবি তুললাম। ধ্বংস স্তুপের পাশে গাছ দেখলাম। তারপর রাত ১১টায় শিবসা নদী দিয়ে নলিয়ান পৌঁছাই।

৩.৪ ইতিহাস বিদদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে শেখেরটেক

সুন্দরবন নিয়ে অনেকে গবেষণা ও বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ অঞ্চলের পুরা কালীন জন বসতি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে ব্যাপক পরিসরে কোন গবেষনা পরিচালনা হয়নি। আর সেই প্রেক্ষাপটে ভয়-সংকুল গভীর জংগলের মাঝে অবস্থিত শেখেরটেক নিয়ে গবেষনা সত্যিই দুরূহ একটি কাজ। তার পরেও সরকারি বা বে-সরকারি পৃষ্ট পোষকতা থাকলে হয়ত এই অঞ্চলের বিলুপ্ত জনগোষ্ঠীর সন্ধান এবং ইতিহাস জানা সম্ভব হতো। কিন্তু এ যাবত কালে শেখেরটেক নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তা মূলতঃ ভ্রমন কাহিনীর বর্ননার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেক্ষেত্রে আমরা যে কজনের নাম সবিশেষ উল্লেখ করতে পারি, তারা হলেন, ঐতিহাসিক এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল, ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী, সাংবাদিক মানিক সাহা, সামনা সুলতানা নিশাত, প্রমুখ। এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যে এ,এফ, এম, আব্দুল জলীল ও সতীশ চন্দ্র মিত্র করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাদের দু'জনই আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছেন। তাই তাদের

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত কর্ম সুন্দরবনের ইতিহাস ও যশোহর- খুলনার ইতিহাস নামক গ্রন্থে বর্নিত তথ্যকে বর্নিত মতামত হিসেবে গ্রহন করা হলো। এ সম্পর্কে আরো যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী অন্যতম। ব্যস্ততার মাঝেও তিনি গবেষনা কর্মের জন্য সময় দেন। নিম্নে তার বক্তব্য তুলে ধরা হলোঃ শেখেরটেক কোন রাজ্য ছিলো না। তবে একটি নগর গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছিলো। তবে নগর প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণেই হয়তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। যতদূর জানা যায় মোঘল সম্রাট আকবরের শাসন আমল থেকে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় পর্যন্ত আরাকানী মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুগণ জলপথে এসে এদেশ লুন্ঠন করতো। সুন্দরবনেও মগ ও পাশ্চত্য দেশ থেকে আগত ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিলো। এ জলদস্যুদের দমন করার জন্য মুঘল আমলের কোন এক সময়ে সুন্দরবনে শেখেরটেক দূর্গ নির্মাণ করা হয়েছিলো। এ দুর্গের উপ সেনাপতি ছিলেন জনৈক শেখ। তবে এই উপ-সেনাপতির প্রকৃত নাম কি ছিলো জানা যায় না। তবে তিনি একজন মুসলমান ছিলেন। ব্লকম্যান বলেছেন, সুন্দরবনে কোন এক সময়ে শহর পথঘাট এবং বাড়িঘর গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিলো। ক্যাপ্টেন মরিসন বলেছেন, সুন্দরবনে ঘনবসতি ছিলো এবং চাষাবাদ হতো। বিভারিজ বলেছেন সুন্দরবনে বড় বড় শহর ছিলো। এতেই বোঝা যায় শেখেরটেকেও একটি নগর গড়ে উঠেছিলো।

বঙ্গোপসাগরের উপকুলে আছে দুবলারট্যাক ও আলোরট্যাক। এর দু'টি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আছে। তবে ট্যাকের মাটি উর্বর। এর ট্যাক দু'টিতে বন জঙ্গল নেই। তাই যখন শেখেরটেকে দুর্গা ও নগর গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিলো তখন এ টেকে কোন গাছপালা ছিলনা। আর বঙ্গোপসাগর তখন শেখের টেকের হয়তো কাছে ছিলো। বর্তমানে শেখেরটেক থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকুল সত্তর কিলোমিটার হবে। বর্তমানে শেখেরটেকের অবস্থান রয়েছে শিবসা নদীর পূর্ব পাড়ে। তবে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'মর্জাল নদী হইতে একটি খাল পূর্বাভিমুখে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে, উহার নাম কালীর খাল। শেখের খাল ও কালীর খালের মধ্যবর্তী অপেক্ষা কত উচ্চভূমি বিশিষ্ট নিবিড় জঙ্গল শেখেরটেক বলে।" ঐতিহাসিক এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল মর্জাল নদীর পূর্ব পাড়ে শেখেরটেক ছিলো মানতে রাজি নন। শেখের টেকের বর্তমান অবস্থান দেখা যায় শিবসার পূর্ব পাড়ে এটা অবস্থিত। আর শেখেরটেক থেকে আরো অনেকদূর পর্যন্ত শিবসা নদী রয়ে গেছে। তারপর শিবসা মর্জালে পড়েছে। তবে আমি সতীশচন্দ্র মিত্রের লেখাকে সমর্থন করে বলতে চাই যখন শেখের টেক নগর গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিলো তখন সেখানে মর্জাল নদীই ছিলো। মর্জালই বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। শেখেরটেক বঙ্গোপসাগরের উপকুল ছিলো বলে ধরে নেয়া যায় তাহলে মর্জালের পাশেই শেখেরটেক গড়ে উঠেছিলো এটাই

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক। শেখেরটেকে বন জঙ্গল ভরে যাবার পর মর্জাল দক্ষিণে সরে গেছে। আর মর্জালের অংশ শিবসা নামে লোকমুখে পরিচিত হয়ে গেছে।

আমি কালী মন্দিরের আশেপাশে পাকা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলাম। কালী মন্দিরটি সুন্দরঘনের একটি প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন। ইহার ভিতরের মাপ ১০-৬´´ X ১০-৬´´ এবং বাহিরে ২১- ৩´´ X ; ভিত্তি ৫´´- ৩´´ । ভিতরের উচ্চতা ২৫ - ৬´´। মন্দিরের পশ্চিমে ও দক্ষিণে দরজা আছে। পশ্চিম দ্বার ৫-৪´´ X ২-৬´´; উপরে খিলানের উচ্চতা ১-৮´´; দক্ষিণ দ্বার ৫-৬´´; খিলানের উচ্চতা ১-৯´´; উত্তরের দিকে ভিতরের ৪ ফুট উচ্চ স্থানে একটি কুলুঙ্গ বা সংবদ্ধ জানালা আছে উহার মাপ ৩ X ২´´ এবং খিলানের উচ্চতা ১ - ৬´´। পূর্বদিকে এরূপ কোন কুলুঙ্গ বা জানালার খাত নাই। মন্দিরের বাইরের ইষ্টকে দেয়ালের কার্নিসে নানা কারুকার্য আছে। উত্তর দিকে দেয়ালে ইস্টক দ্বারা এক প্রকার জাল বা ঝাপরী প্রস্তত করা আছে। দক্ষিণ পার্শ্বে জমি অনেক বসিয়া গিয়াছে। সেজন্যে জঙ্গল হইয়াছে এবং জোয়ারের জল মন্দিরের মূল পর্যন্ত আসে। সুতরাং সেদিকে মন্দিরের গায়ে একটু লোনা ধরেছে। অন্যসব দিকে জমি উঁচু আছে জল ওঠে না; জন্য লোনা ধরে নাই। মন্দিরের শিরভাগে কতকগুলি গাছ জন্মেছে। কালে এতে এই অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শন বিলুপ্ত করবে। এ মন্দিরের ইটের অলংকরন দেখে খ্রীষ্টীয় সতেরো-আঠারো শতকের শৈলী বিদ্যমান আছে।

সতীশ চন্দ্র মিত্র তার ''যশোহর-খুলনার ইতিহাস'' গ্রন্থে লিখেছেন- ''তথা (শিব মন্দির) হইতে বাহির হইলে একটু অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় একটি সুন্দর মন্দির দৃষ্টিপাথবর্তী হয়। সুন্দরবনের ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে বিবিধ কারুকার্যখচিত এবং অভগ্ন অবস্থায় দন্ডায়মান এমন মন্দির আর দেখি নাই।'' তিনি আরো লিখেছেন,''এই মন্দিরটি সুন্দরবনের একটি প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন। কালী মন্দিরটি একটি নিরেট মঞ্চের উপর দাঁড়ানো। মঞ্চের উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং এটি বর্গাকার। মুল মন্দিরটি এক কোঠা বিশিষ্ট। এর ভিতরের দিকে প্রতি বাহুর পরিমাপ ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং বাইরের দিকে ২১ ফুট ৩ ইঞ্চি। মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিমে দরজা আছে। দুটি দরজাই খিলান বিশিষ্ট। 'প্রতিটি খিলান দু কেন্দ্রিক আধাগোলাকার এবং একটি সামান্য উত্তল ফ্রেমে আবদ্ধ। কোনগুলো কৌণিক এবং ব্যান্ডযুক্ত। কার্নিস কেমন ছিল তা ভাঙ্গা অবস্থার জন্য বোঝা কঠিন। তবে এটি তিনধাপবিশিষ্ট ছিল বলে অনুমান করা যায়। শিখর পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং এর উপর নানা ধরনের পরগাছাসহ বুনোগাছ জন্মেছে।.... ভিতর দিকে ছাদ আধাবৃত্তাকার।... বাইরের দিকে দেয়াল পলেস্তরা বিহীন। পশ্চিম পাশের দরজার পরিমাপ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি X ২ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ওপরের খিলানের উচ্চতা ১ ফুট ৮ ইঞ্চি।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ পাশের দরজার পরিমাপ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি X ২ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং খিলানের উচ্চতা ১ ফুট ৯ ইঞ্চি। উত্তর পাশের দেয়ালের ভিতরের দিকে ৪ ফুট উচ্চ স্থানে একটি কুলঙ্গি বা জানালার খাত আছে। এর পরিমাপ ৩ ফুট X ২ ফুট এবং খিলানের উচ্চতা ১ ফুট ৬ ইঞ্চি। মন্দিরের পূর্বদিকে কোন জানালা বা কুলঙ্গি নেই। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগের দিকে উচ্চতা ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চিমঞ্চ ছাড়া বাইরের দিকে এর উচ্চতা ৩৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। যশোর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যায়, ইহার খিলানগুলি গোল নহে, পরন্ত মুসলমান স্থাপত্যানগত খিলানের মত ক্রিকোণ।.... মন্দিরের অন্যান্য প্রকৃতি দেখিলে ইহা যে মোগল আমলে কোন হিন্দু কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা সহজ হয়। ... যদিও মন্দিরের গম্বুজ ছাঁদ আছে, কিন্তু চূড়া নাই, কারণ শীর্ষদেশ জঙ্গল সমাকীর্ণ হইয়াছে.... মন্দিরে কোন দেববিগ্রহ নাই, তবুও অনুমান করা যায় যে প্রতাপাদিত্য তাঁহার দূর্গের সন্নিকটে এই কালিকা দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন।..... মন্দিরের বাইরের ইষ্টকে দেয়ালের কার্নিসে নানা কারুকার্য আছে।"

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সামিনা সুলতানা নিশাত এর মতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবনের নলিয়ান ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে ৩০ কি.মি. দক্ষিণে শিবসা নদীর সাথে শেখের খাল ও কালীর খাল সংযোগ স্থলে শিবসা মন্দির পরিবেষ্টিত প্রত্নস্থল শেখেরটেক-এর অবস্থান। সুন্দরবনের পুরনো ২৩৩ লাটের (বর্তমান ৫২৫ নং ঘের) গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ১.৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আলোচ্য প্রত্নস্থলটির অবস্থান। শিবসা মন্দির কেন্দ্রিক আলোচ্য প্রত্নস্থলটি শেখের টেক বা শেখের বাড়ী নামে পরিচিত। শেখের টেক প্রত্ন স্থলে দুটি মন্দিরের অবস্থান। একটি শিব মন্দির, অন্যটি কালী মন্দির। শিবসা নদীর তীরে মন্দিরদ্বয়ের অবস্থান। একটি শিব মন্দির, অন্যটি কালী মন্দির। শিবসা নদীর তীরে মন্দিরদ্বয়ের অবস্থান বিধায় সাধারণ্যে এটি শিবসা মন্দির বলে পরিচিত। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া তাঁর বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ গ্রন্থে লিখেছেন, "শিবসা নদী থেকে যেখানে শেখের খাল ও কালীর খাল নির্গত হয়েছে, সেখানে ২৩৩ নম্বর লাটের অন্তর্গত শেখের টেক নামক স্থানে প্রাচীন ইমারতাদির বহু ধ্বংসাবশেষ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু সেখানে নদীর ভিতরেও প্রাচীন ইটের ভগ্নাংশ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এখানে দ্বিতল ইমারতের অস্তিত্ব ছিল" । সাম্প্রতিক কালে পরিচালিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদনে এই প্রত্নস্থলের পথ-নির্দেশ ও অবস্থানের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। বিবরণটিতে বলা হয়েছে: খুলনা শহর থেকে সড়ক পথে দাকোপ উপজেলা সদরে পৌঁছে সেখান থেকে সাইকেলে বা মটর সাইকেলে চগে নলিযান লঞ্চ ঘাট থেকে ট্রলারে চড়ে প্রথমে শিবসা নদী ধরে অথবা চালনা থেকে পশুর নদী ধরে অগ্রসর হয়ে বন বিভাগের সুন্দরবন (পশ্চিম) ডিভিসনের আদাচাই টহল ফাঁড়ি (ইউনিট নং ৩) পেরিয়ে আরও দক্ষিণে শেখের কাল ধরে পুরানো ২৩৩ নং লাটের (বর্তমান ৫২৫ নং

Dhaka University Institutional Repository

ঘর) গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ১.৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খালটির পশ্চিম পাড় থেকে ২০০ ।./২১৮.৭২ গজ পশ্চিম দিকে গভীর জঙ্গলের মধ্য হেঁটে গেলে বিভিন্ন স্থানে মোট ৫টি অনুচ্চ সাংস্কৃতিক ঢিবি ও ন্দিরের অবস্থান। বর্ণিত অঞ্চলটি ত্রিকোণাকার ও সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছুটা উঁচু । এ প্রত্নস্থলটি ায় ৬ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে অবস্থিত।

াস্তবিকপক্ষে প্রত্নস্থলটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে বর্তমানে বিরানভূমিতে প্রত্নস্থলটি াবস্থিত। এ স্থলেই এক কালে জনবসতি ছিলো। প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপে স্পষ্ট মন্তব্য করা হয়েছে: পশুর ও মর্জ্জাল দীর মধ্যবর্তী উঁচু জমিতে অবস্থিত 'শেখেরটেক' নামক স্থানের আশে পাশে শেখের খাল ও কালীর খালকে কেন্দ্র রে একটি বিস্তীর্ণ জনপদের অস্তিত্ব ছিলো। কিন্তু সে জনপদ বর্তমানে বিরান অবস্থায় আছে। তারা নির্মাণ রেছিল মন্দির এবং সম্ভবত শাসনকার্যের কেন্দ্রকে রক্ষার জন্য দুর্গও তৈরী করেছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার সাথে মাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সুগভীর সম্পর্ক আছে। কেননা, মন্দির নির্মাণ কোনো একটা বিশেষযুগের বিশেষ র্মতৎপরতা বা চৈতন্যের ফল নয় বরং এর সাথে জড়িত রয়েছে সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি। মন্দির নির্মাণ ও মন্দিরের স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক ড. রতনলাল চক্রবর্তী থার্থই মন্তব্য করেছেন: দেবালয় (মন্দির) প্রতিষ্ঠার স্থান আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম যুগের দেবায়তন গর প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। বর্তমানে জরাজীর্ণ মন্দিরকে জনশূণ্যস্থানে পরিত্যক্ত াবস্থায় দেখে এরূপ মন্তব্য ঠিক হবে না যে মন্দির নির্মানের জন্য স্থান নির্বাচনে কোনো পরিকল্পনা ছিল না। াচীন মন্দিরের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো কোনো নদী প্রবাহের যোগাযোগ ছিল। মন্দির যখন একটা সামাজিক ও াধ্যাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তা লোকালয়ে নির্মাণের পক্ষেই যুক্তি উপস্থাপন করে। এছাড়া র্গ নির্মাণের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত। সুতরাং এ অঞ্চলের ৎকালীন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক ইতিহাস চর্চায় আলোচ্য প্রত্নস্থলের রুত্ব অপরিসীম। কেননা, সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের মধ্যে জনবসতিহীন বর্তমান শেখেরটেক প্রত্নস্থলে দু'টি ন্দির স্থাপনা একদা জনবসতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে, একই সাথে দুর্গের অবস্থান প্রশাসনিক ও সামরিক গুরুত্ব হন করে। অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ লিখেছেন: প্রত্ন তাত্ত্বিক উৎখনন ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ামাণ্য সূত্র থেকে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাতে গাটা বাংলার প্রতিচ্ছবি নেই। হিউয়েন সাঙ সমতট অঞ্চলে ৩০টি সংঘারাম প্রত্যক্ষ করা দাবি করেছেন। কিন্তু ার অধিকাংশ এখনো উন্মোচিত হয়নি। ....ভূ-প্রাকৃতিক বাস্তবতায় অনেক প্রত্নস্থল এখন আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

নয়। দূর্বল নির্মাণ উপকরণ, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ভূমিকম্প প্রভৃতি কারণে বিস্তারিত প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কারের সুযোগ সীমিত হয়ে গিয়েছে। এছাড়া এদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের একমাত্র আইনসম্মত অধিকর্তা সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নানা সীমাবদ্ধতার জন্য কার্যক্রম বিস্তৃত করতে পারছে না। এসব কারণে প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনেকটাই অনুদ্ঘাটিত রয়ে গিয়েছে। তাছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের ইতিহাসের বহুলাংশ এখনো অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। এমনি প্রেক্ষাপটে উক্ত প্রত্নস্থলে খননকার্য পরিচালিত হলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুন্দরবনের ইতিহাস পুনর্গঠনের সম্ভাবনা নিশ্চিত। বস্তুত উক্ত প্রত্নস্থলের সাংস্কৃতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ শেখেরটেকের সামাজিক অবস্থা

সামগ্রিক আলোচনার ফলে একটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়েছে তা হলো শেখেরটেকে এক সময় জনবসতি ছিলো। তাছাড়া শেখেরটেকে বর্তমানে জরাজীর্ণ মন্দিরকে জনশূণ্যস্থানে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখে এরূপ মন্তব্য ঠিক হবে না। যে মন্দির, মন্দির নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচনে কোনো পরিকল্পনা ছিলো না। প্রাচীন মন্দিরের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো কোনো নদী প্রবাহের যোগাযোগ ছিলো। মন্দির যখন একটা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তা লোকালয়ে নির্মানের পক্ষেই যুক্তি উপস্থাপন করে। এছাড়া দুর্গ নির্মানের সঙ্গে আর্থ সামাজিক অবস্থার সাথে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত। সুতরাংএ অঞ্চলের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণে প্রত্নস্থলের গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্দর গভীর অরন্যের মধ্যে জনবসতিহীন বর্তমান শেখেরটেক প্রত্নস্থলে দু'টি মন্দির স্থাপনা একদা জনবসতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ভূ-প্রাকৃতিক বাস্তবতায় অনেক প্রত্নস্থল এখন আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। দুর্বল নির্মাণ উপকরণ, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ভূমিকম্প প্রভৃতি কারনে বিস্তারিত প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কারের সুযোগে সীমিত হয়ে গিয়েছে। তবে প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, খ্রিষ্টীয় ষোল-সতের শতকে কিংবা তৎপূর্বে এ অঞ্চলে একটি বিস্তীর্ণ জনপদের অস্তিত্ব ছিলো।

৪.২ শেখেরটেকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

শেখেরটেক নামক স্থানের আশে পাশে শেখের খাল ও কালীর খালকে কেন্দ্র করে একটি বিস্তীর্ণ জনপদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সে জনপদ বর্তমানে বিরান অবস্থায় আছে। তারা নির্মাণ করেছিলো মন্দির এবং সম্ভবত শাসন কার্যের কেন্দ্রকে রক্ষার জন্য দুর্গও তৈরি করেছিলো। মন্দির প্রতিষ্ঠার সাথে সমাজ; সংস্কৃতি ও সভ্যতার সু-গভীর সম্পর্ক আছে। কেননা, মন্দির নির্মান কোনো একটা বিশেষ যুগের বিশেষ কর্ম তৎপরতা বা চৈতন্যের ফল নয় বরং সাথে জড়িত রয়েছে সমসাময়িক রাজনৈতিক, আধ্যাতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি। মন্দির নির্মাণ ও মন্দির স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্তী যথার্থই মন্তব্য করেছেনঃ (দেবালয় মন্দির) প্রতিষ্ঠার স্থান আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম যুগের দেবায়তন নগর প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত বলে বিশেষজ্ঞগন মনে করেন।[৬৫] সম্রাট আকবরের সময় রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও তদীয় ভ্রাতা বসন্ত রায় যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ বর্গ মাইল ব্যাপী গভীর জঙ্গল পরিষ্কার করে জনাকীর্ণ করেছিলেন। এ স্থানে যশোর

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্যের রাজধানী গড়ে উঠেছিল। গৌড়ের প্রচুর ধন-সম্পদ মুসলিম বাদশাহের কর্মচারী বিক্রমাদিত্য ও তার ভ্রাতা বসন্ত রায়ের হস্তগত হয়। এ সম্পদ সুদুর সুন্দরবন অঞ্চলে এনে একটি ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট্য রাজ্য গঠন করেন। যা পরবর্তী কালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোর রাজ্য। এ স্থান থেকে ক্রমাগত সুন্দরবনের মধ্যে বসতি গড়ে ওঠে। চাক্শী নামক দ্বীপে বসন্ত রায়ের রাজধানী এবং যশোর রাজ্যের নৌবাহিনীর কেন্দ্র ছিলো।

বর্তমানে যেখানে মনুষ্য বসতি পূর্বে সেখানে সুন্দরবন ছিলো। আবার বর্তমানে যেখানে সুন্দরবন যেখানে ভবিষ্যতে মনুষ্য বসতি সমূহ সম্ভাবনা আছে। এখন যে স্থান সুন্দরবন পরিপূর্ণ সেখানে পূর্বে স্থানে স্থানে মনুষ্য বসতি ছিল একথা অনেকেই জানে না এবং তা বিশ্বাস করতে অনেকের কষ্ট হয়। পর্তুগিজেরা এদেশ থেকে চির বিদায় নিয়েছিলো কিন্তু মগেরা অনেক বনাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এদেশে থেকে যায়। বার ভূঁইয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রাজা প্রতাপাদিত্যের দক্ষিণ বাংলার বিশাল এলাকায় শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ধারণা করা হয়, তিনি জলদস্যু ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য শিবসা দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন। জানা যায়, তাঁর পিতৃপুরুষ বিক্রমাদিত্য সুন্দরবন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহ-এর অনুমতি নিয়ে খানজাহান আলীর খলিফাতাবাদ পরগণার কাছাকাছি সুন্দরবন এলাকার বিরাট অংশে শাসন কার্য পরিচালনা করেন।[৬৬] তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য শাসন অঞ্চলকে আরো সম্প্রসারিত করেন। তিনি তাঁর রাজধানীকে অপরূপ সৌন্দর্য মন্ডিত করে তুলেছিলেন এতে তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গিয়েছিলো। সে কারণে তাঁর রাজধানীর নামকরণ করা হয় যশোহর অর্থাৎ গৌড়ের যশঃ হরণকারী। এ নামকরণ ইতিহাসের সাথে জড়িত যশোর জেলা। আধুনিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরপুরী নামক স্থানকে চিহ্নিত করেছেন। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া লিখেছেন, "অসংখ্য নদীনালা ও খাল-বিল পরিবেষ্টিত এবং সভ্য জগত থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্য নির্বিঘ্নেই রাজত্ব করেন। সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উত্তর দিকে বর্তমান যশোর অঞ্চলে তাদের রাজ্যসীমা বর্ধিত হয়। কিন্তু কিছু কাল পরে মোগল সম্রাট আকবরের সেনাবহিনীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষ বাঁধে। প্রতাপ নানা কৌশলে এসব সংঘর্ষ এড়িয়ে রাজত্ব করতে থাকেন।"[৬৭]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দিকেই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। ইসলাম খান তখন বাংলার সুবেদার। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এনায়েত খানের নেতৃত্বে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতাপের বিরুদ্ধে বিপুল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন। জনশ্রুত রয়েছে, তাঁকে দিল্লী নিয়ে যাবার পথে বারাণসীতে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণ ত্যাগ করেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকাল এবং শাসনকার্য সম্পর্কে লিখিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে এ সম্পর্কে জানার জন্য সহায়ক হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসহ অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। রাজা প্রতাপাদিত্যের শিবসা দুর্গ পরিবেষ্টিত প্রত্ন অঞ্চলটিতে খনন কার্য পরিচালিত হলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি ইতিহাস পুনর্গঠনের উপাদান হিসেবে গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হবে নিঃসন্দেহে।

৪.৩ শেখেরটেকের অর্থনৈতিক অবস্থা

জনবসতি গড়ে ওঠার সাথে সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তনও হয়ে থাকে। প্রাপ্ত তথ্যের প্রেক্ষাপটে এটা প্রতিয়মান শেখেরটেকের আশে পাশে নিমক খালাড়ী, অর্থাৎ লবন প্রস্তুতের কারখানা ছিলো। মলঙ্গীরা সুন্দরবনের মধ্যে কারখানা স্থাপন করে নৌকা তৈরি করতো এবং ব্যবসায় তারা বিশেষ লাভবান হত। বর্তমানে এ সমস্ত কুটির শিল্পের নাম নিশানা দেশ থেকে এরূপ মুছে গিয়েছে। দুবলা ভারানী খালের উত্তর তীরে বহু সংখ্যক নেমক খালাড়ীর চিহ্ন ছিলো এবং অদ্যাপি কিছু কিছু নিশানা বিদ্যমান থেকে এ কুটির শিল্পের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ত্রিকোণ দ্বীপেও নেমক খালাড়ীর চিহ্ন দৃষ্ট হয়। সুন্দরবনে আরও বহু স্থানে নেমক খালাড়ীর সরঞ্জাম পাওয়া যায়। এখনও বহুস্থানে মৃন্ময় পাত্র ও বসতি নিদর্শন বিদ্যমান আছে। তবে শেখেরটেকে লবন প্রস্তুত কারখানা ছিলো এমন কোন প্রমান পাওয়া যায় না। তবে একটি বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে তা হলো এখানে কামারবাড়ি ছিলো এবং কামারসহ অন্যান্য লৌহ সরঞ্জাম তৈরি করা হতো। তবে এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল এ ধরনের মতামতকে নাকচ করে দিয়েছেন। সে ধারাবাহিকতায় যে বিষয়টি এখানে গুরুত্ব পাচ্ছে তা হলো দুর্গকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক কার্যক্রম। সামগ্রিক তথ্যের ভিত্তিতে এখানে এক সময় দুর্গ ছিলো তা সম্পর্কে মোটামুটি সন্দেহতীত প্রমানিত। তাই সৈনিকদের পরিবার পরিজনের বসতি এখানে গড়ে ওঠেছিলো। তাই অর্থনৈতিক কার্যক্রম তাদের নিয়েই পরিচালিত হতো। আমি পর্যবেক্ষণ কালীন সময়ে যে বিষয়টি উপলদ্বি করেছি তা হলো শেখেরটেকের অবস্থান সুন্দরবনের মধ্যে সুবিধাজনক উচু জায়গায়। জল ও স্থল পথে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে এবং পাশে নদী ও খালের উপস্থিতি সুবিধা জনক ব্যবসা কেন্দ্র বলেই মনে হয় বা এই ধারণা কে উড়িয়ে দেয়াটাকে ঠিক হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ জন বসতির অস্তিত্ব

সুন্দরবনের সর্বত্র না হলে মধ্যে মধ্যে সুন্দর মনুষ্য বসতি ছিলো তা প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে প্রমানিত। সেই প্রেক্ষাপটে শেখেরটেকে এক সময় সমৃদ্ধ মনুষ্য বসতি গড়ে ওঠেছিলো। সুন্দরবনের প্রাচীন কীর্তিসমূহের ভগ্নাবশেষ এখনও বহুস্থানে বিদ্যমান। প্রতাপশালী জমিদারগণ সুন্দবনের সর্বত্র এমনকি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত জমির দখল দাবি করে বসেন। তখন হেংকেল নদী তীরবর্তী স্থানে বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রায় 'শ মাইল বাঁশ পূতে সীমা নির্দেশ করেন। যা হেংকেলের বাঁশগাড়ি নামে সর্বজন বিদিত। শেখেরটেকে স্থাপত্য কাঠামো, সাংস্কৃতিক নিদর্শন, অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ের আলোকে এখানে এক সময় সমৃদ্ধ জনবসতি ছিলো তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে কারা বা কোন গোষ্ঠীর মানুষ এখানে বসবাস করত তা নিরুপণ করতে খনন কাজের আবশ্যকতা রয়েছে। খনন কাজ পরিচালিত হলে হয়তো আরও অনেক অজানা তথ্য বের হয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। শেখেরটেকের ঢিবি গুলো বিশ্লেষণ করলে এখানে লোক বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। তাছাড়া এখানে জনশ্রুত রয়েছে শেখেরটেকে কামারবাড়ি ছিলো।

৪.৫ শেখেরটেকের অবস্থানগত বিভ্রাট

সতীশ বাবু শেখেরটেকের অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন, "মার্জাল নদী থেকে একটি খাল পূর্বাভিমুখে জংগলে প্রবেশ করেছে এর নাম কালীর খাল, শেখের খাল ও কালীর খালের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি বিশিষ্ট জংগলকে শেখেরটেক বলে। অন্য দিকে এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল সুন্দরবনের ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, " শেখের খাল এবং কালীর খাল শিবসা নদী থেকে পূর্ব দিকে গিয়েছে। মার্জাল নদীর কোন নাম গন্ধ এখানে নাই। শেখের খালের সংলগ্ন উত্তর দিকে শিবসা নদীর তীরে শেখেরটেক অবস্থিত। আমরা একাধিকবার এ অঞ্চল ভ্রমন করে তার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করেছি।"[৬৮] অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী তার সুন্দরবনের বিলুপ্ত নগরী শেখেরটেক প্রবন্ধে বলেন, "শেখেরটেক বর্তমান অবস্থান দেখা যায় শিবসার পূর্ব পাড়ে এটা অবস্থিত। আর শেখের টেক থেকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত শিবসা নদী রয়ে গেছে। তারপর শিবসা মর্জাল পড়েছে। তবে শেখের টেক নগর গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিলো তখন সেখানে মর্জাল নদীই ছিলো। মর্জালই বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। শেখেরটেক বঙ্গোপসাগরের উপকুল ছিলো বলে ধরা যায় তাহলে মর্জালের পাশেই শেখেরটেকে বন জংগল ভরে যাবার পর মর্জাল দক্ষিণে সরে গেছে। আর মর্জালের অংশ শিবসা নামে লোকমুখে পরিচিত হয়ে গেছে।"[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া তাঁর বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ গ্রন্থে লিখেছেন,"শিবসা শিবসা নদী ধরে অথবা চালনা থেকে পশুর নদী ধরে অগ্রসর হয়ে বন বিভাগের সুন্দরবন (পশ্চিম) ডিভিসনের আদাচাই টহল ফাঁড়ি (ইউনিট নং ৩) পেরিয়ে আরও দক্ষিণে শেখের কাল ধরে পুরানো ২৩৩ নং লাটের (বর্তমান ৫২৫ নং ঘের) গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ১.৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খালটির পশ্চিম পাড় থেকে ২০০ মি./২১৮.৭২ গজ পশ্চিম দিকে গভীর জঙ্গলের মধ্য হেঁটে গেলে বিভিন্ন স্থানে মোট ৫টি অনুচ্চ সাংস্কৃতিক ঢিবি ও মন্দিরের অবস্থান। বর্ণিত অঞ্চলটি ত্রিকোণাকার ও সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছুটা উঁচু । এ প্রত্ন স্থলটি প্রায় ৬ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে অবস্থিত।"[৭০]

আমি স্থানটি পর্যবেক্ষনের পূর্বেই অবস্থানগত বিভ্রাট নিয়ে অবগত ছিলাম। তাই সু-নির্দিষ্টভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনি। আমার মতে সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত যে পথ নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে। সেটাই অধিকযুক্তি যুক্ত হয়েছে।

৪.৬ মুঘল আমলের নিদর্শন

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো সুনির্দিষ্ট নির্মাণ কাল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্থাপত্যেও এবং তার নকশা ও স্থাপত্যেও উপকরণ এর ওপর ভিত্তি করে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সময় কাল নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে স্থাপনাগুলোর সময়কাল পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হলোঃ

১ম ঢিবিঃ কোনো স্থানেই কোনো দেয়াল বা মেঝের চিহ্ন দৃশ্যমান অবস্থায় নেই। তবে খনন করা হলে কোনো ভিত-নক্শা অনাবৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত পাওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করে অনুত হয় যে, ইটগুলো গাঁথার জন্য কাদামাটি ব্যবহৃত হয়েছিলো। সুতরাং এর সময়কাল বড়জোড় খ্রিস্টিয় সতের-আঠারো শতকে পিছিয়ে ধরা যায়।

২ নং ঢিবিঃ উল্লিখিত ঢিবির কোনো প্রান্তে কোনো অটুট গাঁথুনির চিহ্ন প্রকাশ্য অবস্থায় নেই। তবে যা কিছু অবশিষ্ট আছে তার ওপর নির্ভর করে এই ঢিবির সময়কাল ১ম ঢিবির অনুরূপ বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় ঢিবি ঃ ২নং ঢিবির ১.৫ কিমি./০.৯৩ মাইল উত্তর দিকে এই ঢিবির অবস্থান। কোনো কোনো ইটের গায়ে সুরকির চিহ্নও লেগে আছে। তাই অনুমিত হয় যে, এই ঢিবিতে অতীতে কোনো স্থাপনার অস্তিত্ব ছিলো। কিন্তু বিলুপ্ত স্থাপনাটির পরিকল্পনা পুনরুদ্ধারের উপযোগী দেয়ালের চিহ্ন আজ আর অবশিষ্ট নেই। তবে ইটের পরিমাপের ওপর নির্ভর করে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া স্থাপনাটিকে ১ নং ও ২নং ঢিবির বিলুপ্ত স্থাপনার পরবর্তী যুগীয় নিদর্শন বলে প্রতিভাত হয়। বন বিভাগের সুপারভাইজার মোঃ হানিফ মজুমদার মৌখিকভাবে অবহিত করেন যে, কিছু দিন পূর্বে এ ঢিবিতে একটি পুরনো মাটির কলসি এবং মাইট (পোড়ামাটির বড় আকারের কলসি) আধাপ্রোথিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

৪র্থ এবং ৫ম ঢিবিঃ এ অংশে পাশাপাশি দু'টি ঢিবি রয়েছে। ৩য় ঢিবির ১.৫ কিমি. উত্তরে এগুলোর অবস্থান। কিন্তু কোনো ঢিবির কোনো স্থানেই ইটের গাঁথনির চিহ্ন দেখা যায় না। অথচ মাটির বয়ন শক্ত এবং রং কালচে ও বাদামি আভাযুক্ত। কোনো কোনো পাটকেলকে খোলামকুচির অনুরূপ মনে হয়। সুতরাং এই ঢিবিতে অতীতে কোনো বসতবাড়ির অস্তিত্ব ছিলো বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া ঢিবি দু'টির উচ্চতা ও অন্যান্য ঢিবির তুলনায় বেশি। তাই খনন কাজ পরিচালনা করা হলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া স্থাপনার ভিত অংশ অনাবৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুন্দরবনের বাওয়ালি (গাছ কাটায় নিয়োজিত শ্রমিক) ও মৌয়ালরা (সুন্দরবনের গাছ থেকে মধু সংগ্রহকারী) এ ঢিবি এবং এগুলোর সংলগ্ন স্থানকে 'বড়বাড়ি' নামে চিহ্নিত করে থাকে। আবার সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর-খুলনা ইতিহাস' গ্রন্থে অনুমান করেছেন যে, এটিই বার ভূঁইয়া নেতা প্রতাপাদিত্যের 'শিবসাদুর্গ'। তিনি এ এলাকার আশে পাশে গত শতকের গোড়ার দিকে উঁচু প্রাচীরের অস্তিত্ব ছিল বলেও উল্লেখ করেছেন। তবে আলোচ্য জরিপকালে তেমন কোনো প্রাচীরের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়নি। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, ১ম, ২য় ও ৩য় ঢিবিগুলোকেই তিনি হয় তো প্রাচীর হিসেবে গণ্য করেছেন। এর উত্তরে-পশ্চিম কোণে আরও একটি ঢিবি আছে। বাওয়ালিরা একে 'শিবমন্দির বলে।

শিব মন্দিরঃ এ ঢিবি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুদূর এগিয়ে গেলে একটি পুকুর এবং পুকুর ঘিরে বেশ কিছু ইট-পাটকেল ছড়িয়ে রয়েছে। আর এরই মধ্যে কেবল গাব গাছের ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। এসবের এক প্রান্তে গভীর বন ও নিচু জমি সংলগ্ন স্থানে 'কালীর খাল' নামে অত্যন্ত সরু একটি প্রবাহ দক্ষিণের জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে। কালীর খালের পাড়ে রয়েছে একটি সুন্দর মন্দির। বাওয়ালি ও মৌয়ালদের নিকট এটি 'কালী মন্দির' নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

কালী মন্দিরঃ এটি একটি নিরেট মঞ্চের উপর দাঁড়ানো। এর দক্ষিণ ও পশ্চিমে একটি করে খিলান-দরজার চিহ্ন আছে। প্রতিটি খিলান দু' কেন্দ্রিক আধাগোলাকার এবং একটি সামান্য উত্তল ফ্রেমে আবদ্ধ। কোণগুলো কৌণিক এবং ব্যান্ড যুক্ত। কার্নিস কেমন ছিলো তা ভাঙ্গা অবস্থার জন্য বোঝা কঠিন। তবে এটি তিনধাপ বিশিষ্ট ছিলো বলে অনুমান করা যায়। শিখর পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং এর ওপর নানা ধরনের পরগাছাসহ বুনোগাছ জন্মেছে। ফলে মূল আদল ১৯১৪ সালের দিকেও বোঝার উপায় ছিলো না। ভিতর দিকে ছাদ আধাবৃত্তাকার। উত্তর দেয়ালে একটি কুলঙ্গি আছে। বাইরের দিকে দেয়াল পলেস্তরাবিহীন। তবে সতীশ চন্দ্র মিত্র লিখেছেন যে অতীতে কার্নিসের নিচে কিছু কারুকাজ ছিলো। তাছাড়া উত্তর দেয়ালে পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল খচিত দেয়াল-খিলান নক্শা রয়েছে। বর্তমানে অত্যন্ত জরাজীর্ণ এবং বোঝার উপায় নেই। তবে কোনো কোনো স্থানে মূল নক্শার ছিটেফোটা চিহ্নিত করা সম্ভব। দক্ষিণ দিকের অংশ ক্ষতিগ্রস্থ এবং যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে। ইটের গড় পরিমাপ ১৭ সেমি. X ১৫ সেমি. X ৫ সেমি.। খিলানগুলো কৌণিক এবং পরত বিশিষ্ট এগুলো চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিলো। সময়কাল আনু. খ্রিস্টীয় সতের শতক।

৪.৭ কামারবাড়ি রহস্য উদঘাটন

শেখেরটেকে নানা ধরনের বসতি ছিলো অনেক পূর্ব থেকেই। সেই বাড়ীগুলোর মধ্যে একটা বাড়ি বেশ জাকজমক ছিলো। যাকে কাঠুরিয়ারা ''কামারবাড়ী বলে আখ্যায়িত করে। কারণ কোনো কালে নাকি সেখানে কামাররা লোহা পিটানো একটি লোহাই পাওয়া গিয়েছিলো। কিন্তু সত্যিকার অর্থে প্রবাদ মাত্র। কেননা দ্বিতল ও বাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখলে মনে হয় এখানে কোন সম্পদশালী ধনীলোক বসবাস করতেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন এখানে অনেক চেষ্টা করেও কামারবাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তার এক্ষেত্রে অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন তিনি বলেন, "বঙ্গোপসাগরের উপকুলে আছে দুবলার চর ও আলোর দোল চর। এর দু'টি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আছে। তবে চরের মাটি উর্বর। এর চর দুটি বন জঙ্গল নেই। তাই যখন শেখের টেকে দুর্গা ও নগর গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিলো তখন এ টেকে কোন গাছপালা ছিলনা। আর বঙ্গোপসাগর তখন শেখের টেকের হয়তো কাছে ছিলো। বর্তমানে শেখেরটেক থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকুল সত্তর কিলোমিটার হবে। বর্তমানে শেখেরটেকের অবস্থান রয়েছে শিবসা নদীর পূর্ব পাড়ে। তবে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'মর্জাল নদী হইতে একটি খাল পূর্বাভিমুখে জঙ্গলে প্রবেশ করেছে, এর নাম কালীর খাল। শেখের খাল ও কালীর খালের মধ্যবর্তী অপেক্ষা কত উচ্চভূমি বিশিষ্ট নিবিড় জঙ্গল শেখেরটেক বলে।" ঐতিহাসিক এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল মর্জাল নদীর পূর্ব পাড়ে শেখেরটেক ছিলো মানতে রাজি নন। শেখেরটেকের বর্তমান অবস্থান দেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

শিবসার পূর্ব পাড়ে এটা অবস্থিত। আর শেখেরটেক থেকে আরো অনেকদূর পর্যন্ত শিবসা নদী রয়ে গেছে। তারপর শিবসা মর্জালে পড়েছে। তবে আমি সতীশচন্দ্র মিত্রের লেখাকে সমর্থন করে বলতে চাই যখন শেখেরটেক নগর গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিলো তখন সেখানে মর্জাল নদীই ছিলো। মর্জালই বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। শেখেরটেক বঙ্গোপসাগরের উপকুল ছিলো বলে ধরে নেয়া যায় তাহলে মর্জালের পাশেই শেখেরটেক গড়ে ওঠেছিলো এটাই হয়তো ঠিক। শেখেরটেকে বন জঙ্গল ভরে যাবার পর মর্জাল দক্ষিণে সরে গেছে। আর মর্জালের অংশ শিবসা নামে লোকমুখে পরিচিত হয়ে গেছে।

সতীশ চন্দ্র মিত্র শেখেরটেক সম্পর্কে বলেছেন, "বাস্তবিকই এই স্থানে উপরে বহুদূর পর্যন্ত নানা বসতি চিহ্ন আছে। তন্মধ্যে একটি বাড়ি বেশ জাকজমকশালী ছিলো বলিয়া বোধ হয়। উহাকে কাঠুরিগণ কামার বাড়ি বলে, কারণ কোন কালে নাকি সেখানে কামার দিগের লোহা পিটান একটি নেহাই পাওয়া গিয়াছিল।" এটা সতীশচন্দ্র মিত্র ও এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল মেনে নিতে রাজি হননি। তবে ইতিহাস প্রমাণ করে মুঘল আমলে যে সব স্থানে দুর্গ নির্মাণ হয়েছে তার মধ্যেই বা আশে পাশে লোহা দিয়ে পিটিয়ে অস্ত্র শস্ত্র তৈরি করা হতো। যারা এ অস্ত্র শস্ত্র তৈরি করতো আজকের দিনে তাদেরকে প্রকৌশলী বলা হয়। আর স্থানীয়ভাবে তখন এ প্রকৌশলীদেরকে কামার বলা হতো। উল্লেখ্য, মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার একটি গ্রামের নাম সিন্দাইন। এ গ্রামে রাজা সীতারাম রায়ের সেনাবাহিনীর অস্ত্র শস্ত্র যারা তৈরি করতো তাদের বসবাস ছিলো এ গ্রামে। তারা ছিলেন মুসলমান। রাজা সীতারাম রায়ের সেনাবাহিনীতে মুসলমান সৈন্যও ছিল। সিন্দাইনে ববাসকারী অস্ত্রশস্ত্র তৈরীতে পটু সৈন্যদের আফগানিস্তানের 'সিন্দান' নামক স্থান হতে আনা হয়েছিল। সিন্দান নাম থেকেই পরবর্তী সময়ে সিন্দাইন গ্রাম গড়ে ওঠে। সিন্দাইনের দক্ষিণ দিকে কামার বাড়িও ছিলো। ষাটের দশকের দিকেও কয়েক ঘর হিন্দু লোহার কামারের বসবাস ছিলো। তাই শেখেরটেকে কামারবাড়ি বা প্রকৌশলীর বাড়ি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয় বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। আসলে প্রকৌশলীর বাড়িই লোকে কামার বাড়ি আখ্যায়িত করেছে। আর দুর্গ থাকলেই সৈন্য অস্ত্র শস্ত্র তৈরি করার জন্য প্রকৌশলী বা কামারের প্রয়োজন হবেই। এটা থেকে আমরা বলতে পারি যে, শেখেরটেকে শুধু দুর্গই ছিলো না। অস্ত্র শস্ত্র তৈরির কারখানাও ছিলো।"

সত্যিকার অর্থে ধারনার ওপর ভিত্তি করে কোনো কথা বলা ঠিক নয়। তাহলে তা বিজ্ঞানসম্মত হবে না। তাই এখানে দু'টি বিষয় বের হয়ে আসে। প্রথমতঃ এখন কোনো নিদর্শন নেই বা আগের যে নিদর্শনের কথা বলা হলেও তার অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই। দ্বিতীয়ত দুর্গ যদি থাকে তাহলে আশে পাশে গোলা বারুদ তৈরি বা অস্ত্র তৈরির

Dhaka University Institutional Repository

কারখানা থাকা স্বাভাবিক। যা অন্যান্য নিদর্শন থেকে যোগসূত্র সৃষ্টি করা সম্ভব। তবে তাকে সঠিক উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না।

৪.৮ কবরস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়নি

কোন এলাকায় জনবসতি থাকলে তার থাকা পাশে কবর থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য তা হতে হবে দীর্ঘদিনের। আমি শেখেরটেক নিয়ে যখন পড়াশুনা শুরু করি তখন কোথাও কবর স্থান বা মনুষ্য কংকাল পাবার তথ্য পাইনি। যদি কংকাল পাওয়া যায় অথবা কবর থাকে তাহলে সেখানে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় নৃতাত্ত্বিক তথ্যকে অনেক সমাজবিজ্ঞানী ব্যবহার করে থাকেন। যদিও আমার গবেষণার অর্থনৈতিক পরিধি খুব একটা বেশি ছিলো না। তবুও কোন সুপারিশ রেখে যাওয়া যায় নাকি তার একটি প্রয়াস প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ছিলো। নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফলে তেমন কোনো চিহ্ন চোখে পড়েনি। তবে সাংস্কৃতিক নিদর্শণে বর্ণনায় ৩য় ঢিবির যে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই জায়গার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো যদি ব্যাপক খনন কাজ করা যায় তাহলে হয়ত কোন নতুন তথ্য উৎঘাটিত হতে পারে, আমরা যদি মানুষের কংকাল পাই। তা হলে অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া সম্ভব। এই অঞ্চল সম্পর্কে যেটা জানা যায় তা হলো এর স্থাপনায় সুরকির চিহ্ন রয়েছে। স্থাপনায় সুরকির ব্যবহার কিন্তু খুব বেশি দিনের নয়।

৪.৯ লোকালয়ে জন্মে এমন বৃক্ষের অস্তিত্ব

স্বাভাবিক অর্থে মনুষ্য বসতির পাশে যে সব বৃক্ষ পাওয়া যায় সুন্দরবনে তা জন্মে না। আবার সুন্দরবনে যে সব বৃক্ষ বিদ্যমান, আবাদকৃত সুন্দরবনে যে সমস্ত বৃক্ষ বিদ্যমান, আবাদকৃত ভূমিতে তা দুস্পাপ্য। সুন্দরবনের ভিতর কোন কোন স্থানে গাব, জাম, বট, জিওল গাছ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলো সুন্দরবনের বৃক্ষ শ্রেনির মধ্যে পড়ে না। তাই মানুষের দ্বারা এই সমস্ত বৃক্ষাদি রোপিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার সুন্দরী, গরান পশুর ইত্যাদি বৃক্ষ লোকালয়ে জন্মে না। তেমনই গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ইত্যাদি পশু সুন্দরবনে নেই। শেখেরটেকে পাকা বাড়ি ঘরের ধ্বংসস্তুপ রয়েছে। রয়েছে মজে বা ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুরের চিহ্ন। তবে অনেক জায়গায় এখনো গাব গাছগুলো দাঁড়িয়ে কালের স্বাক্ষী বহন করছে।

৪.১০ গবেষণা কর্মের প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিম্নে বিশ্লেষণধর্মী সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ

প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এটা প্রতীয়মান হয় যে, খ্রিষ্ট্রীয় ষোল-সতের শতকে দিকে এ অঞ্চলে একটি বিস্তীর্ণ জনপদের অস্তিত্ব ছিলো। তাদের সামাজিক জীবনযাত্রা দূর্গ কেন্দ্রিক ছিলো। তবে এখানে ধর্মীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিলো।

দ্বিতীয়তঃ

শেখেরটেকে মন্দিরের অস্তিত্ব বিদ্যমান। মন্দির প্রতিষ্ঠার সাথে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সু-গভীর সম্পর্ক আছে। কেননা মন্দির নির্মাণে কোনো একটা বিশেষ যুগের বিশেষ কর্মতৎপরতা বা চৈতন্যের ফল নয় বরং সাথে জড়িত রয়েছে সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক পরিস্থিতি। বার ভূঁইয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রাজা প্রতাপাদিত্যের দক্ষিণ বাংলার বিশাল এলাকায় শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তিনি জলদস্যু ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য সুন্দরবনের বিরাট অংশে প্রতিরক্ষা বুহ্য তৈরি করেন। শেখেরটেকে ও তিনি দুর্গ তৈরি করেছিলেন এই কারনে।

তৃতীয়তঃ

বসতি স্থাপনের সাথে অর্থনৈতিক কার্যক্রম জড়িত। তবে সঠিক বা নির্দিষ্ট কোন অর্থনৈতিক কার্য ক্রমে প্রমান বা চিহ্ন পাওয়া যায় ৰা। তবে অবস্থান গত দিক ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সকল সুযোগ সুবিধা এখানে ছিলো।

চতুর্থতঃ

শেখেরটেকে স্থাপত্য কাঠামো, সাংস্কৃতিক নিদর্শন, অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ের আলোকে এখানে এক সময় সমৃদ্ধ জনবসতি ছিলো তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চমতঃ

খুলনা শহর থেকে সড়ক পথে দাকোপ উপজেলা সদরে পৌঁছে সেখান থেকে সাইকেলে বা মটর সাইকেলে চড়ে নলিয়ান লঞ্চ ঘাট থেকে ট্রলার চড়ে প্রথমে শিবসা নদী ধরে অথবা চালনা থেকে পশুর নদী ধরে অগ্রসর হয়ে বন

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের সুন্দরবন (পশ্চিম) ডিভিশনের আদাচাই টহল ফাঁড়ি (ইউনিট নং - ৩) পেরিয়ে আরও দক্ষিণে শেখের খাল ধরে পুরানো ২৩৩ নং লাটের (বর্তমান ৫২৫ নং ঘের) গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ১.৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ- পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খালটির পশ্চিম পাড় থেকে ২০০ মি. /২১৮.৭২ গজ পশ্চিম দিকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে গেলে বিভিন্ন স্থানে মোট ৫টি অনুচ্চ সাংস্কৃতিক ঢিবি ও মন্দিরের অবস্থান পাওয়া যায়। বর্ণিত অঞ্চলটি ত্রিকোনাকার ও সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছুটা উচ্চ। এ প্রত্নস্থলটি প্রায় ৬ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এটিই শেখেরটেকের প্রকৃত অবস্থান।

ষষ্টতঃ

শেখেরটেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্থাপত্য, স্থাপত্যের আকার, নকশা, স্থাপত্যের উপকরণ, সুরকির ব্যবহার, প্রাপ্ত ইটের আকার স্থাপত্যের গাঁথুনি প্রভৃতি বিশ্লেষণে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, এখানকার স্থাপনাগুলো খ্রিষ্টীয়সতের আঠারো শতকের নির্মাণ।

সপ্তমতঃ

সত্যিকার অর্থে ধারনার ওপর ভিত্তি করে কোনো কথা বলা ঠিক নয়। তাহলে তা বিজ্ঞানসম্মত হয়ে না। স্থানটি পর্যবেক্ষণে এখানে কোনো কামারবাড়ির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়নি।

অষ্টমতঃ

পর্যবেক্ষণ কালে এখানে কোনো কবরের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায়নি। তবে ব্যাপকহারে যদি খনন কার্য পরিচালনা করা হয় তাহলে অনেক নিদর্শন খুজে পাওয়া সম্ভব।

নবমতঃ

শেখেরটেকে গাব গাছের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যা সাধারনত সুন্দর বনের বৃক্ষ শ্রেনির সাথে মিলে না। গাব গাছ মুলতঃ মানুষ তার প্রয়োজনে এখানে রোপন করেছিলো। যা কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ গবেষণা কর্মের পর্যালোচনা

শেখেরটেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে বিভিন্ন সময় বিক্ষিপ্ত কিছু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত কোন আলোচনা আজ অবধি হয়নি। তাছাড়া মনুষ্য বসতি, শেখেরটেকে এই বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। গভীর সুন্দরবনের মাঝে এই নিদর্শন নিশ্চিতভাবে লোকালয়ের অস্তিত্বকেই নির্দেশ করে থাকে। তবে এই লোকালয়ের মানুষ কি বিলুপ্ত হয়েছিলো নাকি স্থানান্তরিত হয়েছিলো এমন কোন অনুসন্ধান আজ অবধি হয়নি। যদিও সমস্যা সংকুল স্থানে গবেষণা পরিচালনা করা অতি সহজ কোন বিষয় নয়। তার পরে আমার মূল প্রয়াস হয়তো কোন নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে না। তবে বাংলাদেশের অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে শেখেরটেক উন্মোচিত সামগ্রিক তথ্য অন্যান্য যে কোন নিদর্শনের থেকে সমৃদ্ধ থাকবে। যা নতুন জন্মের কাছে জ্ঞানের খোরাক হয়ে থাকবে। এই গবেষণা কর্মের মাধ্যমে আলোচ্য শেখেরটেকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আস্থা, অবস্থানগত সমস্যার সমাধান, সাংস্কৃতিক নিদর্শনের বিশ্লেষন, বিভিন্ন লেখকের সাক্ষাৎকার, সামগ্রিকভাবে শেখেরটেকের সম্পর্কে এক নতুন ধারনার জন্ম দিবে। তা আমাদের দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষনে গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সূত্র ধরে মনুষ্য অনুসন্ধান, প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চার সাথে সমাজবিজ্ঞানীর যোগসূত্র স্থাপন করবে। সমাজবিজ্ঞান আজ বিভিন্নমুখী চর্চার মাধ্যমে নতুন নতুন ক্ষেত্রের বিকাশ সাধন করছে। আলোচ্য গবেষণা কর্মটি তেমনি একটি প্রয়াস। একটু বাড়িয়ে বলতে গেলে একটি সূচনা যা তথ্যের আঁধার কে আরও সমৃদ্ধ করবে। সমসাময়িক সময়ে মিশরের পিরামিড এর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে পিরামিড তৈরির বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্য সহ তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া আরও অনেক উদাহরণ আমরা দেখতে পাই উপজাতি সমাজে। এই গবেষনা কর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য যদি জ্ঞানের কোন শাখাকে সমৃদ্ধ করে তাহলেই এই গবেষণা কর্মটি সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ উপসংহার

গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের দুর্গম ও শ্বাপদ সংকুল অঞ্চল সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের মধ্যে মোগল আমলের নিদর্শন শেখেরটেকের ওপর পরিচালিত। যেখানে মুলতঃ লোকালয়ের অস্তিত্বের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে তাদের অন্তধীনকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। যদিও একে বিলুপ্ত বলে মনে করার অবকাশ নেই। বাংলাদেশের ইতিহাসও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে জনসংখ্যার ক্রমাগত উধর্ধগতি, লবনাক্ততা, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, বৃষ্টিপাত, ঝড় ও জন সচেতনতার অভাবের কারনে দ্রুত বিলিন হয়ে যাচ্ছে এ দেশের অসংখ্য পুরাকীর্তি তথা সাংস্কৃতিক সম্পদ। যার ফলে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অজস্র সূত্র। তাই শেখেরটেকের বর্তমান অবস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি এ অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা নিরুপণের জন্য পরিচালিত হয়েছে। যা জ্ঞানের শাখাকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার মধ্যে যোগসুত্র স্থাপন করবে। গবেষণা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, খ্রিষ্ট্রীয় ষোল-সতের শতকে কিংবা তৎপূর্বে এ অঞ্চলে একটি বিস্তীর্ণ জনপদের অস্তিত্ব ছিলো। আর এ জনপদের প্রশাসনিক ইউনিটের কেন্দ্রস্থল ছিলো। শিবসা মন্দির, তাই শেখেরটেক প্রত্নস্থলটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জ্ঞাত হলে সুন্দরবনের এ অঞ্চলের ইতিহাসের নতুন ধারার সূত্রপাত হবে। তাছাড়া ইতিহাস শেষ কথা বলে কিছু নেই। যদিও ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচালিত গবেষণা কর্ম দ্বারা কোন ভাবে বিজ্ঞানসম্মত অকাট্য সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তবে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। এটা উল্লেখ করা যেতেই পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ সুপারিশ সমূহ

শেখেরটেকের প্রত্নস্থলের গুরুত্ব অনেক গভীরে প্রোথিত। তাই এ অঞ্চলটির সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধান সম্ভব হলে দক্ষিণ অঞ্চলের ইতিহাসের ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করবে। সেই ধারাবাহিকতায় নিম্নে সুপারিশ সমূহ উপস্থাপন করা হলোঃ

➢ সরকারি পৃষ্ট পোষকতায় অথবা বে-সরকারি উদ্যোগে শেখেরটেকের ব্যাপক খনন কাজ পরিচালনা করা দরকার। খনন কার্যে কবরের অস্তিত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

➢ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য নৃতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনা করার আবশ্যকতা রয়েছে এবং যার মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাকে যোগ সূত্র করে নতুন তথ্যের অবতারনা।

➢ অতিসত্ত্বর কালী মন্দির এর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে মাঝারি ঝড় ও ভূমিকম্পে কালী মন্দির বিলীন হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

➢ সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এখানকার বিবরণকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

➢ আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার কাছে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। যদি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তাহলে তাদের অনুদান এই প্রত্নস্থল সংরক্ষনসহ অন্যান্য গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

➢ শেখেরটেক অঞ্চলটি পর্যটন স্পট হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এবং আদর্শ পর্যটনের সকল সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। তা হলে এ অঞ্চলটি সুবিধার পরিচিতি ও গুরুত্ব বাড়বে।

➢ ওয়েব সাইটে বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ওয়েব সাইটে একে অন্তর্ভূক্ত করে জমি ও ভিডিওর মাধ্যমে এর গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।

➢ গুগোল আর্থের মাধ্যমে যাতে সহজে সুন্দরবনের মধ্যে অবস্থিত শেখের টেক খুজে পাওয়া যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

➢ বনবিভাগকে এই অঞ্চলটি সংরক্ষণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশঃ

[১] লীমা হক, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী 'ঢাক' একটি নৃ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যাঃ ৬৯ ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ. ৭১

[২] Adams, Gerald & Schvanereldt, Jay D. Understanding Research Methods, new yourk Long man, 1985. P. 16.

[৩] ড. খুরশিদ আলম, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, ফেব্রুয়ারী ২০০৩, পৃ. ২৩

[৪] ড. খুরশিদ আলম, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, ফেব্রুয়ারী ২০০৩, পৃ. ২৪০

[৫] জীব বৈচিত্রময় সুন্দরবন, খুলনা সার্কেল, খুলনা, ২০০৪, পৃ. ৩

[৬] আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৩৭৮

[৭] সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোহর- খুলনার ইতিহাস ১ম খন্ড, পৃ. ৮০

[৮] প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

[৯] Khasru Chowdhury, The shibsha temple ``The daily star``. 20 November 2005

[১০] সতীশ চন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[১১] প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, ২০০৪, পৃ. ১০৮

[১২] প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃ.- ১০৭

[১৩] সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃ. ৮১

[১৪] Khasru Chowdhury, `obcit.

[১৫] সামিনা সুলতানা নিশাত ও ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্মন তপু, শিবসা মন্দির পরিবেষ্টিত প্রত্নস্থল: শেখেরটেক, আঞ্চলিক ইতিহাস সিরিজ: খুলনা, ২০০৮, পৃ. ২২

[১৬] অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী, সুন্দরবনের বিলুপ্ত নগরী শেখেরটেক, ইতিহাস ও ঐতিহ্য খুলনা জেলা, ২০১০, পৃ. ১৫৬

[১৭] ইতিহাস ও ঐতিহ্য খুলনা জেলা, প্রাগুক্ত, ২০১০, পৃ. ১৫৭

[১৮] এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস

[১৯] মানিক সাহা, সাংবাদিক সহায়িকা সুন্দরবন অনুসন্ধান

[২০] প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

[২১] রতন লাল চক্রবর্তী, বাংলাদেশের মন্দির, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৯৫, পৃ. ১৩

[২২] এ, কে, এম, শাহ নাওয়াজ,"ভরত ভায়না প্রত্নস্থলের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব, "সামিনা সুলতানা (সম্পাদিত) ইতিহাস: সমকালীন ঐতিহাসিকদের কলমে .....২০০৫, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা: ২০০৫. পৃ. ৮৩

[২৩] শ্রী খন্ড সুন্দরবন, নভেম্বর ২০০৪, সম্পাদনা: দেব প্রসাদ জানা, দীপ প্রকাশনা, ২০৯ এ, বিধান সরনি, কলকাতা-৬

[২৪] বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন (পত্রিকা), ১২৮০ বঙ্গাব্দ

[২৫] সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪০

[২৬] অতুল সুর, প্রবন্ধ, বর্তমান, জুলাই ১৯৮৯

[২৭] বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন(পত্রিকা) ১২৮০ বঙ্গাব্দ

[২৮] বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ১২৮০ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

[২৯] দূর্জটি লস্কর, সুন্দরবন সভ্যতার ইতিহাস, সমকালের জিয়ন কাঠি সাহিত্য পত্রিকা, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা ২০০৮, পৃ. ৬৭

[৩০] বিমলেন্দু হালদার, দক্ষিনবঙ্গ জনসংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা, প্রথম খন্ড, জানুয়ারী ২০০১

[৩১] এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, ১৬৯৭, পৃ. ৪৯

[৩২] প্রাগুক্ত, ১৯৬৭, পৃ. ৪৯

[৩৩] প্রাগুক্ত, ১৯৬৭, পৃ. ৪৯

[৩৪] প্রাগুক্ত, ১৯৬৭, পৃ. ৪৯

[৩৫] প্রাগুক্ত, ১৯৬৭, পৃ. ৬৭

[৩৬] প্রাগুক্ত, ১৯৬৭, পৃ. ৬৭

[৩৭] প্রাগুক্ত, ১৯৬৭, পৃ. ৬৭

[৩৮] সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, খুলনা রূপান্তর, ফেব্রুয়ারী, ২০০১, পৃ. ৪২

[৩৯] আনোয়ারুল কাদির, জন অংশীদারিত্বেমূলক বন ব্যবস্থাপনা প্রেক্ষিত সুন্দরবন, বাদাবন- ২০০৯, খুলনা, রূপান্তর, পৃ. ১৪

[৪০] রিচার্ড ইটনের গ্রন্থটির নাম - The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1740.

[৪১] নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০৭, পৃ. ৮৬

[৪২] গৌরাঙ্গ নন্দী, শমশের আলী ও তৌহিদ ইবনে ফরিদ, চিংড়ী ও জন অর্থনীতি: কার লাভ, কার ক্ষতি, খুলনা, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ১৮

[৪৩] মীর ওয়ালী উজ্জামান, বাদাবনের পাঁচালি, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ. ৭

[৪৪] রকিব উদ্দিন পান্নু, সংস্কার আর কু-সংস্কার নিয়েই ভয়ংকর সুন্দরবন সুন্দরবনে জীবিকার অন্বেষন, দৈনিক জন্মভূমি, খুলনা, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃ. ৭

[৪৫] মৃত্যুঞ্জয় রায়, অন্য সুন্দরবন, বাংলা প্রকাশ, পৃ. ৫৭

[৪৬] মৃত্যুঞ্জয় রায়, অন্য সুন্দরবন, বাংলা প্রকাশ, পৃ. ৫৯

[৪৭] মৃত্যুঞ্জয় রায়, অন্য সুন্দরবন, বাংলা প্রকাশ, পৃ. ৫৯

[৪৮] মৃত্যুঞ্জয় রায়, অন্য সুন্দরবন, বাংলা প্রকাশ, পৃ. ৬০

[৪৯] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৭৮

[৫০] প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

[৫১] সুব্রত কুমার সাহা, পরিবেশ বিজ্ঞান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৭, পৃ. ১০৮

[৫২] খসরু চৌধুরী, 'অনন্ত দাতা' দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা, ১লা জানুয়ারী ২০১১, পৃ. ৮

[৫৩] মীর ওয়ালীউজ্জামান, বাদাবনের পাঁচালি, দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ঢাকা, ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ. ৭

[৫৪] হিঙ্কেল সাহেবের আমলে বড় দিঘি ও ভবন তৈরি করা হয়েছিলো। ভবনটি বর্তমানে নদীগর্ভে বিলিন হলেও বড় দিঘিটির এখনো রয়ে গেছে। কাছারিপুকুর হিসেবে এই দিঘিটি এ অঞ্চলে বেশ পরিচিত।

[৫৫] আশরাফ-উল-আলম টুটু, সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় নারীর জীবন, এসবিসিপি ওয়াচ গ্রুপ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ৯

[৫৬] প্রাগুক্ত, ২০০৩, পৃ. ৯

[৫৭] ইমাম আল হক, সুন্দরবন লক্ষ সুন্দরীর বাস, দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৯ মার্চ ২০০৫, পৃ. ১১

[৫৮] খসরু চৌধুরী, 'অনন্ত দাতা', দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ঢাকা, ১ জানুয়ারী ২০১১, পৃ. ৮

[৫৯] জীব বৈচিত্র্যময় সুন্দরবন, খুলনা সার্কেল, খুলনা, ২০০৪, পৃ. ৩

[৬০] আ স ম হেলাল সিদ্দিকী, এক পলকে সুন্দরবন, ঝিনাইদহ: রেজিনা বেগম, ১ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

[৬১] সিরাজুল ইসলাম, (সম্পা:) বাংলাপিডিয়া, খন্ড-১০, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, পৃ. ২১০

[৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

[৬৩] মোঃ মোশারফ হোসেন, সুন্দরবনের পুরাকীর্তি (প্রবন্ধ) দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ৫ মার্চ ২০০৫ সাল

[৬৪] এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, ১৯৬৮, পৃ. ৬৪

[৬৫] রতন লাল চক্রবর্তী, বাংলাদেশের মন্দির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৯৫, পৃ. ১৩

[৬৬] এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, ১৯৬৮, পৃ. ৬৫

[৬৭] আবুল কালাম যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

[৬৮] প্রাগুক্ত, ১৬৯৭, পৃ. ৪৯

[৬৯] প্রাগুক্ত, ২০১০, পৃ. ১৫৬

[৭০] প্রাগুক্ত, ২০০৭, পৃ. ৩৬৩